বারীন্দ্রনাথ দাশ

আভেনির ॥ কলকাতা ১৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

প্রকাশক
অমলেন্দু চক্রবর্তী
আভেনির
২৩৮বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলকাতা ৯

দাম চার টাকা

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

রচনাকাল

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

এই লেখকের অন্যান্য বই—

কর্ণফুলি

রঙের বিবি

বেগম বাহার লেন

পূর্বরাগের ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)

এই উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতি নিতান্তই কাল্পনিক। কোথাও কোনো সাদৃশ্য সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত।

হাজরা পার্কের পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে রাস্তার ওপাশে দমকলের ঘাঁটি পেছনে ফেলে একটু এগুলেই একটি সরু পথ বাঁয়ে ঘুরে গেছে।

সে পথ ধরে আনমনে এগিয়ে ডাইনে বাঁয়ে মোড় ফিরে হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখবেন একটা খোলার বস্তির মধ্যে এসে পড়েছেন। এপাশে ওপাশে কোনোদিকেই পথের দিশা নেই। কেন যে অকারণ শর্টকাট করতে গিয়েছিলেন, একথা ভেবে নিজেকে গালাগাল দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে হয়তো দেখতে পাবেন একটি শীর্ণ তাল গাছের নিচে একটি টিউবওয়েল। একদল মেয়ে পুরুষ সেখানে বালতি হাতে ঘটি হাতে দাঁড়িয়ে। সেই জনতার মাঝখান থেকে শোনা যাবে চড়া গলায় বাছা বাছা অভিধান বহির্ভূত শব্দ সম্ভার। তখন মনে হবে ওদিকে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করে আপনার গন্তব্য স্থলে পৌঁছানোর শর্টকাটের নিশানা জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা। একটু ভেবে স্থির করবেন যে, না, বাঞ্ছনীয় নয়। তখন আবার বাঁয়ে সরু গলির ভেতর ঢুকে পড়বেন নিজের পথের সন্ধান নিজেই করে নেওয়ার প্রচেষ্টায়।

কিন্তু কয়েক কদম গিয়েই আপনি দাঁড়িয়ে পড়বেন।

আপনি দাঁড়িয়ে পড়বেন কারণ তখন আপনার কানে ভেসে আসছে একটি মিষ্টি সুর।

সেতারের।

বড়ো মিঠে হাতে কাফি রাগের আলাপ বাজছে।

এ রকম ঘিঞ্জী বস্তি অঞ্চলে সুর সাধনার পাট বসিয়েছে কে?
—আপনি ভাববেন।

বড়ো জোর ভাঙা হারমোনিয়ামে স্থূল ভাষায় সস্তা গজল, তার বেশী কিছু আশা করবার নয় এ অঞ্চলে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখবেন আপনি।

দেখবেন এটা বস্তি অঞ্চল হলেও এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে এখানে অনেক ভদ্র পরিবারের বাস। "ভদ্র" সংজ্ঞাটি তাদের সাবেক ঐতিহ্যগত, সাম্প্রতিক অর্থনীতিগত নয়। জীর্ণ পর্দার ফাঁকে তাদের জীবন যাত্রার দুঃসহ দৈন্য অতি সহজেই পথচারীর চোখে পড়ে।

আশে পাশের অনেক বাড়ির অনেক জানলার মধ্যে অন্যতম একটি জানলার ফাঁক দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন ভেতরের আধো অন্ধকার ঘরে পাটি পেতে বসে আছে একটি অতি সাধারণ আধ ময়লা লাল পাড় শাড়ি পরা, পিঠে চুল ছড়িয়ে দেওয়া, গায়ের রং শ্যামল, চোখ দুটো টানা, মুখের গঠন মিষ্টি কিন্তু সুন্দর বলা চলে না, এমন একটি আটাশ বছরের মেয়ে।

নিজের মনে সে হয়তো সেতার বাজিয়ে চলেছে।

সাধারণ রকম ভালো সমঝদার আপনি। হয়তো বুঝে নেবেন যে মেয়েটির হাত খুব তৈরী, অনেকদিনকার সাধনা।

আলাপ শেষ করে গৎ ধরবে মেয়েটি। জলদ তানের বৈচিত্র্যে সৃষ্টি করবে সুরের মায়াজাল। ঝালায় আর ঝঙ্কারে আপনাকে ভুলিয়ে দেবে পারিপার্শ্বিক জীবনের দৈন্য।

আপনার মন থেকে কোথায় কতদূরে মিলিয়ে যাবে কলতলায় জল নিয়ে ঝগড়ার হট্টগোল, আকাশের ও প্রান্তে মেঘের আড়ালে কোথায় ভেসে যাবে বকের পাঁতি, আপনার খেয়াল থাকবে না।

তারপর শেষ হবে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম পুঁছবে সেই মেয়েটি।

আপনি ভাববেন, কে এই শিল্পী, যাকে কোনো আসরে বা জলসায় দেখেছেন বলে আপনার মনে পড়ে না—।

আপনাকে বলে না দিলে হয়তো জানবেনই না যে এ মেয়েটি হোলো ছবুলা গাঙ্গুলী।

নামটা বললেই আর বলে দিতে হয় না কে সে।

শুধু সে এদেশের স্বধর্মনিষ্ঠ শিল্পী বলেই আজো তার সাধনা চলে এই পরিবেশেই।--

কিন্তু কয়েক বছর আগেও সে এ অঞ্চলে থাকতো না।

তখনো মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারকে এসব অঞ্চলে এসে ভিড় জমাতে হয় নি।

তখন সে থাকতো টালিগঞ্জের এক মধ্যবিত্ত গলিতে।

লক্ষ্ণৌর নিখিল ভারত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল, ঠুংরি আর সেতারে প্রথম হয়ে চারদিকে খুব নাম।

সেই বছর কয়েক আগেও ছবুলা গাঙ্গুলীর সেতারে কাফি রাগ একজনকে চঞ্চল করে তুলেছিলো।

সে বছরটা উনিশশো উনপঞ্চাশ, মাসটা যতদূর মনে পড়ে, এপ্রিল।

আগামী নভেম্বরে এম-এ পরীক্ষা, এপ্রিল মাসে বিমল সাহার চোখে তারই দুঃস্বপ্ন। রাতগুলো থমথমে, অন্ধকার। দিনগুলো চৈতালী রোদ্দুরের উষ্ণ দ্যুতিতে ঝলমলো।

তেমনি এক রোববার দুপুরে হস্টেলের তেতলার চওড়া বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে তালপাতার পাখায় হাওয়া খেতে খেতে বিমল সাহা মনের দুঃখে আর আলস্যে এক বিরাট হাই তুললো।

সামনের চেয়ারের উপর একটি খাতা খোলা। তার উপর একটি কলম।

খাতার খোলা পাতায় শুধু দুটি লাইন,—দুটি নয়, ঠিক দেড় লাইন লেখা ঃ

মঞ্জীর বাজে কার দু'পায়ে—রিম্ ঝিম্।
অঞ্জন চোখে তার···—

ব্যস, ওই পর্যন্ত।

আড় চোখে এপাশে ওপাশে হস্টেলের রুদ্ধ-দ্বার ঘরগুলোর দিকে তাকিয়ে বিমলের মনটা তেতো হয়ে উঠলো। আজ বাদে কাল পরীক্ষা, তবু পড়াশুনোর নাম গন্ধ নেই, বসে বসে গানের কথা বুনবার অপপ্রচেষ্টা।

কিন্তু এসব না করে যে পড়ার বই খুলে বসবে, সে উপায়ও নেই। গান একটি লিখে ছবুলাকে দিতেই হবে আজ। সামনের শনিবার শো, আজকের রিহার্স্যালে এটি না দিলেই নয়।

ছবুলা, মীনা, এরা ফিফ্থ ইয়ারে পড়ে। সুবোধ বোস, দীপক

মিত্র, রঞ্জন গুহ ওরা বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে এসেছে। এসব চ্যারিটি শো করা, রিলিফ ফাণ্ডের জন্যে টাকা তোলা ওদের পোষায়। বিমলের পরীক্ষা সামনে—

কিন্তু কী কুক্ষণে যে মীনার ঢলঢলে চোখের অনুনয়ে আর ছবুলার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে রাজি হয়েছিলো!

ব্যাপারটা ওদের কাছে মনে হয়েছে খুব সহজ। মীনা নাচবে সেই অনুষ্ঠানে। সঙ্গে গান গাইবে ছবুলা। সে গানের সুর বেঁধে দিয়েছে, কিন্তু তখনো গানের ভাষা তৈরী হয়নি। অতএব, যেহেতু সহপাঠী মহলে নাটক লেখবার কবিতা রচনা করবার খ্যাতি আছে বিমলের, তারই উপর পড়লো মীনার নাচের জন্যে গানের ভাষা তৈরী করবার ভার।

কিন্তু নাচের সঙ্গে গান কী দরকার? সে কথা বিমল অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছে সবাইকে। ভালো নাচের সঙ্গে কেউ গান গায় নাকি? ভালো অর্কেস্ট্রা থাকলেই—

হৈ চৈ করে সবাই থামিয়ে দিয়েছিলো বিমলকে। ভালো নাচের সঙ্গে ভালো গান খুব চলে। মণিপুরীতে চলে, ভারত নাট্যমে চলে, কথাকলিতে তো বটেই, তেমন তেমন গান আর সঙ্গত হলে কথককেও জমিয়ে দেওয়া যায়।

যাই হোক, একটা কিছু দাঁড় করানো যেতো নিশ্চয়ই। চারটে কলির ষোলোটি লাইনের একটি গান লিখতে কতক্ষণ আর লাগে। আধুনিক বাঙলা গানের ভাষার কতকগুলো বাঁধাধরা বুলি আছে। তা'র থেকে বেছে বেছে কয়েকটি কথা এলোমেলো বসিয়ে দিলেই আধুনিক বাঙলা গান তৈরী হয়ে যায়। এই বিন্যাস-সমবায়ের কৌশল যে যতো ভালো জানে সেই ততো ভালো গীতিকার।

কিন্তু তাতে ভুলবার মেয়ে নয় ছবুলা। তার সবটাতেই

মৌলিকতা চাই। সে সোজাসুজি কাফি রাগে একটি গৎ বাজিয়ে শোনালো বিমলকে। শুনতে বেশ লাগলো। কিন্তু একটু পরেই তা'র চোখ কপালে উঠলো যখন সে শুনলো, ছবুলার বাজিয়ে শোনানো সুরের বাঁধা ছকেই তাকে ভাষা বুনে দিতে হবে।

তা'র সেই কপালে ওঠা চোখ ছুটো একেবারে উল্টে যাওয়ার উপক্রম হোলো যখন ছবুলা বললো, "আরেকটা কথা বলবার আছে। তোমার ওই একঘেয়ে গানের ভাষা আমি চাই না। ওসব শুনে শুনে কান পচে গেছে। সেই পাপিয়া, বুলবুল, কুঞ্জকানন, ফুল-ডোর, আকাশে চাঁদ আর তারা আর ভালো লাগে না। নতুন ধরণের ভাষা দাও, বিমল, একেবারে নতুন ধরণের ভাষা দাও। হবে না বলছো? কেন হবে না! এখনকার কবিরা কবিতায় যে ধরণের নতুন ভাষা ব্যবহার করছেন, সে ভাষা ব্যবহার করো। নতুন জিনিস চাই বিমল, নতুন ভাষা দাও আমাদের, আমরা নতুন সুর সৃষ্টি করবো।"

"কিন্তু এখনকার কবিতায় তো আর লাইন মেলাতে হয় না", বিমল বলেছিলো।

ছবুলা একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলো, "লাইনের অমিলই এখন-কার কবিতার সব চেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য নয়। সেটা সব চাইতে অকিঞ্চিৎকর বৈশিষ্ট্য। যাই হোক, তুমিও লাইন মিলিও না।"

"গানের কলিতে লাইন মেলাবো না, সে আবার কী কথা",— ছবুলার কথা শুনে বিমল অবাক।

"অতো মেলানোর কী দরকার?" বলেছিলো ছবুলা, "শুধু আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, এই চারটে কলি রেখো, আর প্রত্যেক কলির শেষ শব্দটায় মিল রেখো। ব্যস, বাদ বাকি ছেড়ে দাও নিজের খেয়ালের উপর। গানের সুর মনের ভেতর থেকে যে কথা খুশী টেনে বার করে এনে বসিয়ে দিক নিজের

বাঁধা তালের ছকে ছকে। এই ধরো সুরটা হচ্ছে এরকম—",বলে বাজিয়ে শোনালো তার সেতারে,—ডা রা ডা রা ডা রা ডা, ডা রা ডা রা ডা রা ডা, ডা রা ডা—। ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি,—"মনে করো এই সুরে যদি বসিয়ে দিই—," বলে গেয়ে শোনালো,

"মঞ্জীর বাজে কার ছ'পায়ে,—রিম্ ঝিম্।
অঞ্জন চোখে তার—"

সেখানেই থামলো ছবুলা।

থামতেই বিমল বললো, "তারপর ?"

"তারপর কি হবে জানলে তো আমি নিজেই গানটি লিখতাম্। ও কাজ তোমার। এবার শুধু শুনে নাও সুরটা কি রকম এগুবে—।"

বিমল শুনলো।

সেই সুরের মাধুর্য কালকের রাত, আজকের সকাল ছপুর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কিন্তু—অস্থির হয়ে উঠলো বিমল—এ সুরে বুনবার মতো ভাষা তা'র আসছে না যে……!

হঠাৎ রাগ হোলো মীনার উপর। কেন যে সে ছবুলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো !

মীনার কথা মনে পড়তেই—……

মীনার কথা মনে পড়তেই মনে পড়লো তার চোখ ছটোর কথা, সব সময় চোখে কাজল পরে থাকে সে।

কোত্থেকে ঝিরঝির হাওয়া এসে বিমলের মন আর শরীর জুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

চোখ তুলে চেয়ে দেখে রোদ মিলিয়ে গেছে। মেঘ করেছে আকাশে। সেখানে কালবৈশাখীর আভাস।

বিজলী খেলে গেল আকাশের কোলে।

মনে পড়লো ছবুলার দেওয়া সুর। নিজের মনে মনে গুণ গুণ করে সেই সুরটা ভাঁজলো বিমল। তারপর হঠাৎ উঠে বসে কলমটা তুলে তর তর করে লিখে গেল :

অঞ্জন চোখে তার
বিজলী যে হেনে যায়
মেঘ ডাকে দুরুদুরু মনে কার,
শুনি তা'র
মঞ্জীর,—রিম্ ঝিম্।

কী আশ্চর্য ব্যাপার, বিমল ভাবলো। ছবুলার ফরমাশে কবিতা আসে না কিন্তু মীনার কথা মনে পড়লেই কবিতার বান জাগে, সে কবিতার কোনো মানে থাক বা নাই থাক। তর তর করে লিখে চললো সে :

ঝঞ্ঝার মতো তা'র যৌবন,
আগুন-পাহাড় তা'র অন্তর,
কুন্তল ঘণ ভার
বৈশাখী মেঘ যেন,
বন্যার মতো প্রাণ দুর্বার—
শুনি তার
মঞ্জীর ;—রিম্ ঝিম্।

কলমটা থামলো। এভাবে মীনার প্রশস্তি গেয়ে চললে তো ছবুলা খুশী হবে না। রোমান্টিক গান ছবুলা চায় না। গানের ভাষায় রিয়্যালিজ্‌ম্ না থাকলে ওর পছন্দ হয় না। কিন্তু কী রিয়্যালিজ্‌ম্ আনা যায় গানের মধ্যে ?

একটু মাথা চুলকালো বিমল।

তারপর লিখলো :

চঞ্চল পায়ে তা'র
ঘুম-ভাঙা পৃথিবীর
অস্থিরতা।
পথের নিশানা তা'র
দূর করে সংশয় শঙ্কা।

এটা ঠিক রিয়্যালিজম্ হোলো কি?—কলমটা দাঁতে কামড়ে ধরে বিমল ভাবলো।

তারপর ভাবলো, যাক চুলোয়। একটা কিছু হলেই হোলো। নাচবে তো মীনা, তা'র আবার রিয়্যালিজম্।

তারপরের লাইনগুলি আসতেও দেরী হোলো না। বিমল লিখে গেল:

বন্দিনী পৃথিবীর বেদনায়,
উদ্বেল তা'র স্বর সঞ্চার,
দুঃখের পারাবার
মন্থনে উঠে এলো
কে নূতন উর্বশী জনতার—।
শুনি তা'র
মঞ্জীর;—রিম্ ঝিম্।

লেখাটা শেষ করে বিমল একটি পরিতৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। যাক, বাঁচা গেল। ছবুলার কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দেওয়া গেছে।

এবার এটি ছবুলার কাছে পৌঁছে দিলেই তার কর্তব্য শেষ।

বাইরে বৃষ্টি নামলো অন্ধকার করে।

বুড়ো রঘু চাকরটা জলখাবার দিয়ে গেল। এলুমিনিয়ামের প্লেটে একরাশ আটার লুচি আর আলুর তরকারি।

মুখে লুচি পুরে বিমল ভাবলো,—আচ্ছা, ছবুলাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায় না? সে যদ্দুর জানে, কেউ লেখেনি আজ পর্যন্ত। যে মেয়ে দিনরাত নাটক আর গানের উপর নতুন নতুন থিওরী ঝাড়ে, কে কবিতা লিখবে তাকে নিয়ে? যে মেয়ের কাছে গেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে হয়, সহজ হওয়া যায় না অনেকদিনের পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও, তাকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়, কবিতা লেখা যায় না, বিমল ভাবলো।

ছবুলা। কবিতা লিখবার মতো নাম কিন্তু। কে দিয়েছিলো অমন মিষ্টি নাম? একদিন সে জিজ্ঞেসও করেছিলো ছবুলাকে।

ছবুলা একটু হেসে বলেছিলো, "ছেলেবেলায় বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন ছবি। মা ডাকতেন ছবু। একদিন আদর করে ডেকে বসলেন ছবুলা। সেদিন থেকে সে নামই রয়ে গেল।"

বিমল মনে মনে হাসলো। বেশ ভালো মেয়ে ছবুলা, ঠিক সে ধরণের ভালো মেয়ে যাদের নামে কবিতা হয় না, বড়ো জোর ছড়া হয়। একটি ছড়া তক্ষুনি এসে গেল বিমলের মনে—

ছবুলা, ছবুলা,
ফুচকা আলু-কাবলি খাবে
জান করেছে কবুলা—।

একদিন শোনাতে হবে ছবুলাকে, বিমল ভাবলো।

কিন্তু যেতে হবে আজই! আর কী জোর বৃষ্টি পড়ছে—।

তবু না গিয়ে উপায় নেই, জল ঝড় যাই হোক। মীনা নাচবে ছবুলার গানের সঙ্গে। সুতরাং যেতেই হবে বিমলকে।

কানে ভেসে এলো ভরা জলের বুকে আরো উপচে পড়া জলের আলোড়নের দূরাগত সাড়া।

নিচের কলঘরে জল এসেছে।

ঘরে ঢুকে ওপরের তাক থেকে সাবান আর দেওয়ালের ব্র্যাকেট থেকে তোয়ালে পেড়ে নিলো বিমল সাহা।

নিচের জলে ভেজা উঠোনে বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হৈ চৈ হট্টগোল করে টেনিস বল দিয়ে ফুটবল খেলছে ফার্স্ট ইয়ারের বাচ্চা ছেলেরা।

চারটে বেজে গেল। ঝোড়ো বৈশাখী বৃষ্টির বিরাম নেই। রান্না-ঘরে বসে চায়ের কেটলিতে জল ঢালতে ঢালতে বন্ধ জানলার কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে বাইরের আকাশটা তাকিয়ে দেখলো ছবুলা।

সন্ধ্যেবেলা রিহার্স্যাল মীনাদের বাড়ি।

বৃষ্টি না থামলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

টালিগঞ্জের সরু গলিটিতে এরই মধ্যে জল দাঁড়িয়ে গেছে।

এক কাপ চা তৈরী করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আধো অন্ধকার ঘর। ঘরের ভেতর দড়ির উপর দু'তিনটে ভেজা শাড়ি শুকোতে দেওয়া। তাতেই যেন স্যাত স্যাতে ভেজা ভেজা হয়ে উঠেছে ঘরখানি। এক কোণে উঁচু তক্তপোশের উপর আধময়লা বিছানায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে একজন।

ছবুলা এসে ডাকলো, "চা এনেছি, খেয়ে নাও মা। তারপর সাবু তৈরী করে দিচ্ছি।"

মুখের উপর থেকে কাঁথাটি সরালেন ছবুলার মা। গাল ভেঙে তুবড়ে যাওয়া, চোখ দুটো গর্তে বসে যাওয়া, পাণ্ডুর মুখ। জ্বরে ভুগছেন বহুদিন ধরে।

বললেন, "সাবু আর ভালো লাগে না ছবু। আমি কিছু খাবোনা।"

বেচারী মা! জোর করে মুখে হাসি ফোটালো ছবুলা।

বললো, "আজ একটু খেয়ে নাও। কাল কি পরশু থেকে ভাত

খাবে তুমি। এই তো সেরে উঠলে বলে। আর তো জ্বর আসে নি তোমার? নাও, চা টা খেয়ে নাও।

রান্নাঘরে ফিরে এসে নিজের জন্যে এক কাপ চা বানিয়ে নিলো, তারপর নিজের মনে গুণ গুণ করে ভাঁজতে লাগলো একটি সুর, যে সুরে বাঁধা গানের সঙ্গে মীনা নাচবে। তারপর ভাবলো বিমল কি গানটা তৈরী করে এনে দিতে পারবে আজ? বেচারার এবার ফাইন্যাল ইয়ার, ওর উপর এতটা জুলুম করা ঠিক হয়নি হয়তো।

চা'টা শেষ করে নিজের মনে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মায়ের জন্যে সাবু তৈরী করতে বসে গেল ছবুলা। মনটা তার একটু বিষণ্ণ হোলো। এদিকে মায়ের অসুখ,—এখন নাচ গানের রিহার্স্যালে যোগ দেওয়া কি তার সাজে?

সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরে এসে ওর বাবা যখন দেখেন মেয়ে বাড়ি নেই, শুনতে পান মেয়ে গেছে গানের রিহার্স্যালে, রাগ করে বকাবকি করেন মাকে। কিন্তু মেয়েকে কোনো কথা বলতে সাহস পান না, কারণ রেডিওতে গান গেয়ে, গ্রামোফোন কোম্পানীতে গানের রেকর্ড করে, হপ্তায় দু'দিন পাড়ার স্কুলে গান শিখিয়ে, রোববারদিন ভবানীপুরের একটি গানের স্কুলে সেতার শিখিয়ে দু'চার পয়সা যা ঘরে আনে ছবুলা, এই অভাবের সংসারে তার অনেক দাম।

বাপের যা আয় তাতে বাড়ি ভাড়া আর চাল ডালের সংস্থান করতেই সব ফুরিয়ে যায়। মাসের কয়েকদিনের বাজার আর ছোটো ছেলেটির স্কুলের মাইনে, ছবুলার কলেজের মাইনে সব কিছু ছবুলার আয় থেকেই।

সুতরাং সহ্য করেন মেয়েকে,—কিন্তু বোঝেন না, বোঝবার চেষ্টাও করেন না।

সেখানেই ছবুলার দুঃখ। তার জীবনে স্বপ্ন আছে অনেক……।

—কিন্তু গরীবের মেয়ের স্বপ্ন মধ্যবিত্ত গরীব বাপের কাছে চির-কালই দুর্বোধ্য।

একসময়, যখন সুদিন ছিলো, শিবপদবাবু শখ করে ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছিলেন মেয়েকে। সে মেয়ে যখন প্রতিযোগিতার পর প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে চললো খেয়ালে, ঠুংরিতে, ভজনে, সেতারে, আর স্কুলের কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার অভিনয় দক্ষতায় সংগ্রহ করে চললো মেডেলের পর মেডেল, শিবপদবাবুই স্বপ্ন দেখতে সুরু করলেন মেয়ের সম্বন্ধে।

মেয়ের চেহারা ভালো নয়, বাপের টাকা নেই—কিন্তু যদি তার গানের খ্যাতি ভালো জামাই জুটিয়ে দেয়!

কোথায় কবে যেন কোন এক তরুণ আই-সি-এস পথ চলতে চলতে অজানা বাড়ির খোলা জানলা থেকে ভেসে আসা অচেনা মেয়ের গান শুনে তাকে না দেখেই ঘটক পাঠিয়েছিলো মেয়ের বাপের কাছে, সে গল্প শিবপদবাবু শুনেছিলেন তাঁদের অফিসের বড়বাবুর কাছে।

তারপর দিনের পর দিন জানলার কাছে বসে হুঁকো খেতে খেতে সে স্বপ্ন শিবপদবাবুও দেখেছেন কতোবার।

আই-সি-এস এলো না, কিন্তু তাঁদের মতো অবস্থার লোকের কাছে লোভনীয় দু'একজন পাত্রের পিতৃপক্ষ থেকে যে লোভনীয় প্রস্তাব দু'একটি আসে নি, তা ও নয়।

কিন্তু শিবপদবাবুর এসব পরিকল্পনার ধার দিয়েও গেল না ছবুলা।

তখন গান আর অভিনয় নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাকে।

নিজের বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে তৈরী করেছে একটি অভিনয়ের দল তারপর কোথায় বন্যা হ, কোথায় কোন স্কুলের বাড়ি তৈরী হচ্ছে না, কোথায় কে ফাণ্ডের টাকা উঠছে না—তাদের জন্যে চ্যারিটি শো করে বনের মোষ তাড়ানোর কাজেই বেশী উৎসাহ দেখা গেল ছবুলাদের মধ্যে।

তারপর দেশে এলো দুর্দিন।

জামাকাপড় চাল ডালের দর আকাশমুখী হওয়া পরিবেশে অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লো শিবপদবাবুর, নিজের আয়ে সংসার চলে না।

তখন কিছু টাকা ঘরে আনতে সুরু করলো ছবুলা।

সুতরাং শিবপদবাবুর আপত্তির সুর মিইয়ে এলো, তবু যেন মেয়েটির একটি বিয়ে দিতে পারলে খুশি হতেন তিনি।

কিন্তু বিয়ের নাম শুনলেই ক্ষেপে উঠতো মেয়েটি।

বলতো, "আমার ওসব বিলাসিতার সময় নেই বাবা, সামনে আমার অনেক কাজ।"

কী কাজ, সে কিছুতেই বুঝতে পারতেন না শিবপদবাবু।

"বিয়ে করে ওসব কাজ করা যায় না?" তিনি জিজ্ঞেস করতেন।

"হবে না কেন, খুবই হয়," ছবুলা উত্তর দিতো, "তবে যে ধরণের ছেলেকে বিয়ে করলে ও সব কাজে অসুবিধে হয় না, ও ধরণের ছেলে এখনো চোখে পড়ে নি বাবা।"

উত্তর শুনে বাপের মুখে যে ভাব ফুটে উঠতো সেটা পর্যবেক্ষণ করে মনে মনে হাসতো ছবুলা।

মনের ভয় মনে চেপে বাপ শুধু বলতেন, "ছেলের আর ধরণ ধারণ কি ছবু! ভালো ছেলে, সচ্চরিত্র ছেলে, নিজে খেটে খায়, ভালো চাকরি করে, এর বেশী কোন মেয়ে কামনা করতে পারে?"

ছবুলা হাসতো।

বলতো, "সব মেয়েই এই কামনা করে, কিন্তু পায় কি ? কিন্তু যাতে একদিন এমন একটা দিন আসে যখন সব মেয়েই এরকম একটি ছেলে পেয়ে সুখে সংসার করতে পারে, আর সব ছেলেই নিজে খেটে আয় করে নিজের সংসারকে খাইয়ে দাইয়ে সুখে রাখতে পারে, সেদিন আসন্ন করে আনবার চেষ্টায় আছে যারা, তাদের পক্ষে সংসারের ছোটো গণ্ডির মধ্যে বাঁধা পড়া আপাততঃ সম্ভব নয়, আর যা'র তা'র সঙ্গে সম্ভব নয়। মনে করো আমিও তাদেরই একজন।"

একথা শুনে শিবপদবাবু একটু ভুরু কুঁচকে তাকাতেন। জিজ্ঞেস করতেন, "পলিটিক্স করছিস নাকি ?"

"ঠিক পলিটিক্স নয়," ছবুলা উত্তর দিতো, "তবে রাজনৈতিক আন্দোলনটি যেই বৃহত্তর আন্দোলনের অঙ্গ, সেই আন্দোলনেরই আরেকটি ফ্রণ্টেই আমার কাজ।"

আলোচনার মধ্যে বাঁপের হঠাৎ কোন ফাঁকে মনে পড়তো আজ অফিসে বলে দিয়েছে এবছর পূজোর বোনাস দেওয়া হবে না। মুদির দোকানে বলে দিয়েছে কাল থেকে চালের দর বেড়েছে ছু' টাকা করে। ছেলেটির শার্টগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে একখানায় এসে ঠেকেছে।

তখন বলে বসতেন, "ও সব বড়ো বড়ো কথা আমাদের মুখে সাজে না ছবু। পলিটিক্স গরীবের জন্যে নয়।"

বাপের ম্লান মুখ দেখে ছবুলা বুঝতো বাপের মনের ব্যথাটি কোথায়। ভাবতো চুপ করে যাই।

তবু উত্তরটা বেরিয়ে পড়তো মুখ দিয়ে।

বলতো, "গরীবের জন্যেই তো পলিটিক্স বাবা। এই যে এত দাম দিয়ে চাল কিনছো, সেটা পলিটিক্স, ছেঁড়া জামা পরছো, সেটা পলিটিক্স, বাড়ি ভাড়া দিচ্ছো, সেটা পলিটিক্স, ছু'বেলা ঠিক মতো

খেতে পাচ্ছো না, সেটা পলিটিক্স। মা অসুখে ভুগছেন, ঠিক মতো ডাক্তারের ফী জুটছে না, সেটা পলিটিক্স। পলিটিক্স বাদ দিয়ে গরীব লোক বাঁচতে পারে বাবা ?"

বাইরের বৃষ্টি আস্তে আস্তে কমে এলো।

সাবু তৈরী করে মাকে খাইয়ে দিলো ছবুলা।

ছবুলার বাবা বেরিয়েছেন সেই দুপুরে। সাড়ে পাঁচটা প্রায় বাজে। তখনো বাপের দেখা নেই।

সেতারটি পেড়ে নিয়ে ছবুলা বললো, "আচ্ছা মা, এ সুরটা শোনোতো কি রকম লাগে। মীনার নাচের সঙ্গে যে গানটি গাইবো তারই সুর।"

অসুখের মধ্যে আবার সেতারের পিং পিং! প্রথমটা মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন ছবুলার মা।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরের যে মায়াজাল সৃষ্টি করলো ছবুলা, তাতে তিনি ভুলে গেলেন যে তাঁর শরীরটা খারাপ। সুরটা যে মেয়ের নিজের তৈরী সেকথা জানতেন।

মনে মনে ভাবলেন, "বেচারী মেয়েটি যদি কোনো বড়লোকের ঘরে জন্মাতো তা'হলে কতো সুযোগই না পেতো সে। এত প্রতিভাই যদি পেলো তো গরীবের ঘরে কেন জন্মালো!"

মায়ের চোখ দু'টি ছলছল করে উঠলো।

মায়ের মনের কথা বুঝতো ছবুলা। বাজনা থামিয়ে একটু হেসে বললো, "মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো মা? গরীবের ঘরে জন্মেছি বলেই বুঝেছি গান বাজনা অভিনয়ের কতো দাম আমাদের মতো গরীব লোকের জীবনে। এসব মানুষের কতো উপকারে, কতো কাজে লাগানো যায়। যদি বড়লোকের মেয়ে হয়ে জন্মা-

তুম, এসব হোতো পোষাকী খেয়াল, একটি বর জুটিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে লাগতো না।"

"এসব গরীবের কী কাজে লাগে মা?" বললেন ছবুলার মা, আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন একটুখানি।

"কেন মা, এই যে তোমার অসুখ সারিয়ে দিলাম," বলে ছবুলা হাসলো।

ম্লান হাসলেন ছবুলার মা।

"শুধু এই?" জিজ্ঞেস করলেন খুব নরম গলায়।

"না মা। গান গেয়ে দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। দেখবে একদিন। সেদিন ভাববে, আমার মেয়ে ছবুলা এত কাজ করলো?"

মা হেসে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোর বাবা ফিরলেন না এখনো?"

"ফিরবেন এবার। ছ'টা প্রায় বাজে, ফেরার সময় হয়েছে।"

দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

"নিশ্চয়ই বাবা," বললো ছবুলা।

উঠে গেল দরজা খুলে দিতে।

শিবপদবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। ভেজা ছাতাটা এক কোণে রেখে এসে জুতোটা খুলে এনে রাখলেন ভেতরের দাওয়ায়।

রান্নাঘরে বসে চা করতে করতে ছবুলা ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "রাস্তার জল কি নেমে গেছে বাবা?"

"হ্যাঁ, নেমে গেছে। বেশী জল তো হয়নি। কেন, তুই কি বেরুবি নাকি কোথাও?"

মেয়ে বেরিয়ে এলো চায়ের কাপ হাতে করে।

"যাবি কোথায় ?"

"মীনাদের বাড়ি," ছবুলা উত্তর দিলো।

"কেন ?"

"আমাদের চ্যারিটি শো-র রিহার্স্যাল সেখানে।"

আজ খুব যেন গম্ভীর মনে হোলো শিবপদবাবুকে।

চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর বললেন, "পরের জন্যে চ্যারিটি করছিস। আমাদের চ্যারিটি করে কে ?"

"সে কথা বোলো না বাবা," ছবুলা উত্তর দিলো, "চ্যারিটি করছি বন্যার দুর্গতদের জন্যে।"

"আমাদের কিসের গরজ ?"

"ওরা যে আমাদের চেয়ে আরো গরীব, বাবা !"

শিবপদবাবু একঘটি জল নিয়ে উঠোনের এককোণে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর চায়ের কাপ নিলেন ছবুলার হাত থেকে।

তারপর বললেন, "এসব নিয়ে যারা মাথা ঘামাতে চায় ঘামাক। তুই কেন এসব নিয়ে পড়ে আছিস ?"

ছবুলা চলে যাচ্ছিলো। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমায় তা'হলে গান বাজনা কেন শিখিয়েছিলে, বাবা ?"

ম্লান হয়ে গেল শিবপদবাবুর মুখ।

কয়েক মুহূর্তের দীর্ঘ স্তব্ধতার পর আস্তে আস্তে বললেন, "ছবুলা, কাল তোকে বলিনি। চাকরিটা গেছে।"

ছবুলা চোখ মেলে তাকালো বাপের দিকে।

"কাল ওরা আমায় এক মাসের নোটিস দিয়েছে।"

"এদ্দিনকার চাকরি—?"

"হোলোই বা এদ্দিনকার চাকরি। এত বছর কাজ করবার পরও তো আমাদের পার্মানেণ্ট করা হয়নি।"

ছবুলা খুব মিষ্টি করে হাসলো, "এই ব্যাপার?"

আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো বাপের কাছে।

বললো, "তার জন্যে দুঃখ কেন করছো বাবা, আমিতো আছি। আর তুমিও কি বসে থাকবে? দেখো না, আরেকটি ঠিক জুটে যাবে কোথাও।"

তারপর পা বাড়ালো পাশের ঘরের দিকে।

ছ'টা বাজলো ঢং ঢং করে।

দু'পা এগিয়ে ছবুলা ফিরে এলো।

এসে আস্তে আস্তে বললো, "বাবা, মাকে এখন কিছু আর বোলো না।"

রিহার্স্যাল মীনা মিত্রের বাড়ি।

সাতটা প্রায় বাজে। ছবুলা এসে পৌঁছোয়নি তখনো।

মীনার মাষ্টার সুবোধ বোস, যার হাতে ছিলো আবহসঙ্গীত পরিচালনার ভার, তখন অন্য মেয়েদের নিয়ে একটি ব্যালে নাচের মহলা দিচ্ছিলো।

মীনা বসেছিলো এক পাশে, ছবুলার অপেক্ষায়। দেখলো ঘরের ওপাশে কি একটা কাগজ হাতে নিয়ে ওর দাদা দীপক আর দীপকের বন্ধু রঞ্জন খুব হাসাহাসি করছে।

মীনা এগিয়ে গেল সেদিকে।

শুনলো বিমল বলছে, "কি করবো, ভাষাটা এ ধরণের না হলে যে ছবুলার পছন্দ হয় না।"

দীপক উত্তর দিলো, "ছবুলা যা বলেছে তুমি ঠিক বোঝো নি। ও কী চায় না সেটা তোমায় বলেছে। ও মোলায়েম মিনমিনে ভাষা চায় না, দখিন হাওয়া, পাপিয়ার ডাক, চামেলীর গন্ধ,—এসব সে চায় না। ভাষায় প্রাণ চায় ছবুলা। তোমায় তাই বলেছে। কিন্তু তুমি করেছো কি ?—

চঞ্চল পায়ে তা'র
ঘুম-ভাঙা পৃথিবীর
অস্থিরতা ? ? ?

—এ গানের ভাষা ? লোকে তেড়ে মারতে আসবে যে ! এই ছ্যাখ মিনু, বিমল তোর নাচের জন্যে গান লিখে এনেছে।"

কাগজটি হাতে নিয়ে মীনা পড়লো ঃ

মঞ্জীর বাজে কা'র দু'পায়ে—
রিম্ ঝিম্
অঞ্জন-চোখে তা'র
বিজলী যে হেনে যায়—

চোখ তুলতে ওপাশের দেওয়ালে টাঙানো বড়ো আয়নায় চোখ পড়লো। নিজের কটাক্ষে নিজেই লজ্জা পেলো মীনা।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভালো লেগে গেল গানটি।

ভাবলো,—ঝঞ্ঝার মতো যৌবন ? কী অসভ্য বিমলটা !

একটু রাগ হোলো বিমলের উপর। তবু যেন মনে হোলো গানটি নেহাৎ অপছন্দ করবার মতো নয়।

বললো, "কেন, খারাপ হয়নি তো।"

"মোটেই ভালো হয়নি," দীপক উত্তর দিলো, "কোনো এক বিশেষ ধরণের কবিতা হিসেবে কোনো কোনো কাগজের সম্পাদক এই লেখাটি ছেঁড়াকাগজের ঝুড়িতে ফেলে নাও দিতে পারে। কিন্তু নাচের সঙ্গে এটা অচল। বাপস্, কী ভাষা ! জনতা ? পথের নিশানা ? বন্দিনী পৃথিবী ? লোকে টিকিটের দাম ফেরত চাইবে।"

"টিকিটের দাম ফেরত চাইবে কেন ?"

সবাই ফিরে তাকালো।

ছবুলা এসে গেছে।

"টিকিটের দাম ফেরত চাইবে কেন, দীপক ?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

মেয়েদের ব্যালে নাচ থেমে গেল।

"বিমলের লেখা গানটি শুনলে যে কেউ টিকিটের দাম ফেরত চাইবে," দীপক উত্তর দিলো।

"দেখি, কি লিখেছে—," ছবুলা মীনার হাত থেকে কাগজটি নিয়ে

পড়তে লাগলো আর নিজের মনে গুণগুণ করে ভাঁজতে লাগলো গানের সুরটি।

রঞ্জন বললো, "আরম্ভটা মন্দ নয়। প্রথম লাইন ঠিকই আছে—মঞ্জীর বাজে কা'র দু'পায়ে—। কিন্তু রিম্‌ঝিম্ লোকে বৃষ্টির ধারা বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করে, ঘুঙুরের আওয়াজ বোঝাবার জন্যে নয়। আর তারপর অন্য সব লাইনই গানে অচল।"

ছবুলা চোখ তুলে তাকালো। দেখলো যে এই ছেলেটি তার অচেনা, আগে কোনোদিন তাকে দেখেনি। লম্বা, ফর্শা, সুন্দর দেখতে, চোখা নাক, বেশ বড়ো বড়ো চোখ।

আস্তে আস্তে বললো, "আমি যদি ঘুঙুরের আওয়াজ যে বৃষ্টির ধারার মতো শুধু সে'টি বোঝাবার জন্যেই 'রিম্‌ঝিম্' ব্যবহার করি, তা'হলে ক্ষতি কি?"

"কি জানি, আমার ভালো লাগছে না।"

"কি রকম হ'লে ভালো হোতো বলে আপনার মনে হয়?"

রঞ্জন উত্তর দিলো, "আমি তো কবিতা লিখি না, তাই ঠিক উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারবো না। তবু মনে করুন, যদি এরকম হোতো—

মঞ্জীর বাজে কা'র দু'পায়ে,
রুণু ঝুন।
চঞ্চল সমীরে
অঞ্চল দুলে যায়
বন পথে ঝরা পাতা
ঝরে যায় ঝিরি ঝির—

—আমি অবশ্যি মেলাতে পারলাম না, তবে আমার মনে হয় এরকম হ'লে নাচের জন্যে ভালোই হোতো। কি বলো দীপক?"

দীপক ঘাড় নাড়লো।

মীনা হাসলো একটুখানি।

ছবুলা হাসলো না। বললো, "আপনি যা বললেন, সে সব তো দু'হাজার দু'শোটা বাঙলা গানে ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন কিছু ভাবুন না।"

রঞ্জন যেন একটু উষ্ণ হোলো।

বললো, "নতুন জিনিষ তো অবাঞ্ছনীয় নয়। তাই বলে—চঞ্চল পায়ে তা'র ঘুম-ভাঙা পৃথিবীর অস্থিরতা—এ সব ঢোকাতে হবে নাকি গানের মধ্যে? লোকে একটি সুন্দর মেয়ের নরম নাচ দেখতে আসবে, তার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি গান শুনতে আসবে। নাচের গান তো আর জনতার জয়গান হতে পারে না।"

"কে বললে পারে না," ছবুলা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

রঞ্জন তাকালো ছবুলার চোখের দিকে।

দেখলো সে চোখ একটু অন্য ধরণের চোখ।

গলার সুর নামিয়ে বললো, "আমার মনে হয় এ গান জমবে না।"

"আমি যদি জমিয়ে দিতে পারি," ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"তা' হলে বলবো সেটা আপনার গলার ও সুরের কৃতিত্ব, গানের ভাষার নয়।"

"বেশ। আপনি একটি গান লিখুন, বা আপনার চেনা কাউকে দিয়ে লিখিয়ে আনুন। বিমলের গানে আমি যে সুর দিচ্ছি, সেই সুরে আপনার গানটি গাইবো—। গান দুটো শুনে সবার যেটা ভালো লাগে তাই পছন্দ করে নেওয়া যাবে।"

রঞ্জন কি উত্তর দেবে চট করে ভেবে পেলো না।

একটু ইতস্তত করে বললো, "সবই তো আমরা আগে থেকে অনুমান করে বসে আছি। এ গানের সঙ্গে আপনার সুর জমবে কিনা;

আপনার গানের সঙ্গে ওঁর নাচটা উতরোবে কিনা সে সব না শুনে না দেখে কি করে বলি ?”

“অতো তর্ক করে লাভ কি,” দীপক বললো, “মীনার নাচটা হয়ে যাক একবার। তারপর স্থির করা যাবে এটা চলবে কি চলবে না।”

সুবোধ বোস তার সরোদটি তুলে নিলো। অন্য কয়েকজন মেয়ে তুলে নিলো সেতার আর এস্রাজ আর বেহালা। দীপক টেনে নিলো তার গীটার। ছবুলা তার তানপুরোটা কোলে তুলে নিলো।

পায়ে ঘুঙুর বেঁধে মীনা ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

রঞ্জন সিগারেট ধরালো।

বিমল সামনে ঝুঁকে বসলো তার চেয়ারে। তার চোখে উৎকণ্ঠা।

তার দিকে একবার তাকালো ছবুলা। সে চাউনিতে কোমল আশ্বাসের নম্র স্নিগ্ধতা। তারপর তাকালো মীনার দিকে। তাকিয়ে একটু হাসলো।

মীনা সে হাসি ফিরিয়ে দিলো।

চ্যালেঞ্জটা তাদের দু'জনেরই। বিমলের মুখ রাখতে হবে।

সুবোধ বললে, “আচ্ছা, রেডি।—এক দুই তিন চার—এক দুই তিন চার—এক...”

সুরু হোলো।

হঠাৎ যেন তুফান জাগলো মীনার হৃদয়ের উত্তাল সমুদ্রে। মনের আকাশে কালো হয়ে এলো উন্মাদ সুরের মেঘ। আশেপাশের সবাই যেন দূরে সরে সরে মিলে গেল কোন দূরান্ত সমুদ্রপারের পৃথিবীর জনতায়। নিজের অনুভূতির ঢেউয়ের দোলায় একান্ত নিঃসঙ্গ মনে হোলো নিজেকে। কানে ভেসে এলো সুদূরের নতুন জীবনের এক অচেনা সুরেলা ডাক। মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো সেই নতুন পৃথিবীতে গিয়ে পৌঁছানোর জন্যে। অস্থির পদসঞ্চারে

মুখর হয়ে উঠলো সেই ব্যাকুলতা। তারপর কখন দেখলো সুরের পরিক্রমায় সেই নতুন পৃথিবীকে সে পেয়ে গেছে তার হৃদয়ের মধ্যে, নিঃসঙ্গ জীবনের উত্তাল সমুদ্র বহু দূরে সরে গেছে। মেঘ কেটে গেছে আকাশ থেকে, আর ভালোবাসার শ্যামলিমায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে চারদিক, আলোয় আলোকময় হয়ে উঠেছে। বড়ো চুপচাপ, বড়ো স্তব্ধ। ভালো লাগলো মীনার। আস্তে আস্তে অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠলো চারদিক থেকে। সবাই তার আপন, সবাই তার চেনা, সবাই তার অন্তরঙ্গ।

সবার দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসলো।

"চমৎকার হয়েছে," বললো সুবোধ বোস।

রঞ্জনের সিগারেটে দীর্ঘ হয়ে উঠেছে না-ঝাড়া ছাই।

ছবুলা বিমলের দিকে তাকিয়ে।

বিমলের মুখে পরিতৃপ্তির সলজ্জ আভাস।

রঞ্জন আস্তে আস্তে ছবুলাকে জিজ্ঞেস করলো, "কি করে পারলেন?"

ছবুলা বললো, "কি?"

"বিমল যে ভাবে গানটি লিখেছে, তা'তে সুর দিলে শুনতে ভালো লাগবে ভাবতে পারিনি। আহা! এরকম সুরের কাজ! তার সঙ্গে ও রকম কথক-স্কুলের নাচ। ভাবতেই পারি নি। দেখলাম তাও হোলো, অদ্ভুত ভালো ভাবেই হোলো। আর সব মিলিয়ে যে সার্থক কি একটা দাঁড়ালো, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার। কিন্তু পারলেন কি করে, সেটাই ভাবছি।"

ছবুলা হাসলো একটুখানি।

তারপর উত্তর দিলো, "জানেন, যখনই যা কিছু করবার চেষ্টা করি, সাধারণ মানুষকে পরিবেশন করবার জন্যেই করি। কারণ, যা কিছু

সত্যিকারের ভালো, সে যে সবারই ভালো লাগবে, একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস না করলে কিছুই সৃষ্টি করা যায় না। নাক-উঁচু মন নিয়ে আর্টের সাধনা হয়না।"

রঞ্জন একটু ভাবলো কি যেন।

তারপর চোখ তুলে তাকালো ছবুলার দিকে।

দেখলো,—একটি সাধারণ মেয়ে, সুশ্রী, কিন্তু সুন্দর নয়। ময়লা রং। পরনে সাধারণ তাঁতের শাড়ি। কিন্তু আয়ত চোখে মনে-দাগ-কাটা ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা।

বললো, "আরেকদিন বসে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইলো। আজ শুধু এটুকু বলতে চাই যে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম।"

ছবুলা হেসে উত্তর দিলো, "কিন্তু আপনার পরিচয় তো এখন পর্যন্ত আমি পাই নি। আপনি—…।"

"আমি রঞ্জন গুহ।"

"ও——।"

রঞ্জনের নাম ছবুলা শুনেছে। পোস্টগ্র্যাজুয়েটে পড়তো এককালে। আধুনিক বাঙলা গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্যে ছাত্রমহলে ওর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা। রেডিওতেও প্রোগ্রাম পায় মাঝে মাঝে। ওর গানও শুনেছে ছবুলা। খুব সাধা বা মাজাঘষা না হলেও বেশ উদাত্ত মিষ্টি গলা। সে জন্যেই ওর গান সবার খুব পছন্দ।

হ্যাঁ, এদের এই অনুষ্ঠানে তো ওর একটা প্রোগ্রাম নেওয়ার কথা হচ্ছিলো, এতক্ষণে মনে পড়লো ছবুলার।

ছবুলা তাকিয়ে দেখলো রঞ্জনকে।

রঞ্জন তাকিয়ে দেখলো ছবুলাকে।

বিমল একবার তাকালো ছবুলার দিকে। তারপর তাকালো

রঞ্জনের দিকে।

ভাবলো,—আমার লেখাটা ফেরত নিই। এত কষ্ট করে সারা দুপুর ভেবে ভেবে লিখলাম, অথচ লেখা সম্বন্ধে কেউ একটি কথাও বললো না!

কিছুক্ষণ আগে ছবুলার মুখে তার লেখা গান শুনে যে মুগ্ধ আনন্দের মাধুর্য তার মনকে রঙিন করে দিয়েছিলো, সেটা তেতো হয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেল।

উঠে পড়লো বিমল।

"এরই মধ্যে চললে কোথায়," দীপক জিজ্ঞেস করলো।

ছবুলা চোখ তুলে তাকালো।

কোনো কথা বললো না।

"সামনে পরীক্ষা," বিমল উত্তর দিলো, "তোমাদের মতো হৈ চৈ করলে তো আমার চলবে না। গান লিখে দিতে বলেছিলে, লিখে দিয়েছি। তোমাদের পছন্দ হয়েছে। আমারও কাজ ফুরিয়েছে। আমি এবার উঠি।"

ছবুলা একটু হেসে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

রঞ্জন একবার তাকালো ছবুলার দিকে। তারপর তাকালো বিমলের দিকে। তার ভুরু দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত হলো।

মীনার চোখ দু'টি বিমলের উপর মেলে ধরা।

বিমল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

"বিমল বুঝি আপনার খুব বন্ধু," রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো ছবুলাকে।

"আমার সব গানগুলো ওই লিখে দেয়," ছবুলা মুখ না তুলে উত্তর দিলো।

মীনা হঠাৎ উঠে পড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিমল তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করেছে।

মীনা বারান্দার উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলো—বিমল !

বিমল মুখ তুলে তাকালো।

"তোমার গানটি খুব ভালো হয়েছে বিমল। আমার খুব ভালো লেগেছে," মীনা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললো।

বিমল একটু ম্লান হেসে নামতে সুরু করলো।

"কাল এসো," মীনা ডেকে বললো। •

"আচ্ছা।"

ঘরের ভিতর শুধু একজন কারো মুখের দিকে তাকালো না। সে মীনার দাদা দীপক।

সে তার গীটার ডিং ডিং করতে করতে তাকিয়েছিলো কড়িকাঠের দিকে। মুখে একটু বাঁকা হাসি।

মীনা যখন ঘরে ফিরে এলো তখন ব্যালে নাচটির মহলা আবার সুরু হয়ে গেছে।

রিহার্স্যাল যখন শেষ হোলো তখন দশটা প্রায় বাজে। দু'পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

রঞ্জন ছবুলাকে বললো, "চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দি'।"

ছবুলা একটু বিব্রত বোধ করলো।

বললো, "পৌঁছে দেওয়ার দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারবো।"

সে কথা কানে তুললো না রঞ্জন। বললো, "রাত হয়েছে অনেক। আজ না হয় একা নাই ফিরলেন।"

"না। একা যেতে কিছু অসুবিধে হবে না। এটুকু পথ হেঁটে

গিয়ে ট্রাম ধরবো। আর আমার বাড়িও ট্রাম স্টপ থেকে বেশ কাছেই।"

রঞ্জন ছবুলার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললো, "এমন বাদলা রাত। পথে লোকজন বেশী নেই। কোথায় কখন কি হয় কিছু বলা যায়?"

"প্রত্যেকদিন তো আমি একাই ফিরি।"

"আজ না হয় একা নাই ফিরলেন। এই তো পরশু দিন কারা যেন রসারোডের মোড় থেকে একটি মেয়েকে জোর করে ট্যাক্সিতে তুলে পালাবার উপক্রম করছিলো। কাছেই একটি পুলিস-ভ্যান ছিলো বলে পেরে ওঠেনি। আজও সেখানে পুলিস-ভ্যান থাকবে এমন কোনো কথা নেই।"

ওরে বাবা! ছবুলার গা ছমছম করে উঠলো।

তবু মুখে একটি নির্লিপ্ত হাসি ফুটিয়েছিলো সে। নিস্পৃহতার ভান করে রাজী হলো শেষ পর্যন্ত।

ট্রামে পাশাপাশি বসে এসেছিলো ছবুলা আর রঞ্জন।

কিন্তু কেউ কোনো কথা বলেনি।

ট্রাম থেকে নেমে গলির মোড়ে এসে ছবুলা বললো, "অনেক ধন্যবাদ। আর কষ্ট করতে হবে না আপনাকে। বাকী পথটুকু আমি একাই যেতে পারবো।"

"আপনার বাড়ি কোনটা," জিজ্ঞেস করলো রঞ্জন।

ছবুলা দেখিয়ে দিলো।

রঞ্জন হাসলো।

বললো, "আপনি আমার বাড়ির এত কাছাকাছি থাকেন তা' তো জানতাম না।"

"আপনিও এ পাড়ায় থাকেন নাকি?"

"হ্যাঁ, সম্প্রতি উঠে এসেছি। আমি থাকি পাশের গলিতে। কালী ম্যানশান্-এ।"

পাশের গলির কালী ম্যানশান্ এক মস্তো বড়ো বাড়ি। অসংখ্য এক কামরা দু'কামরার আধো অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ফ্ল্যাট, সে-গুলোতে অসংখ্য নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস। ও বাড়িতে ছবুলার চেনাশোনা পরিবার আছে দু' তিনটে। ছবুলা সেখানে গেছেও অনেকবার।

সেই বাড়িতে থাকে জনপ্রিয় গায়ক রঞ্জন গুহ?

তার সুন্দর চেহারা আর পরিষ্কার জামাকাপড় দেখে ছবুলা তাকে সমাজের আরো একটু উঁচু স্তরের মানুষ ভেবে-ছিলো।

"আসবেন একদিন সময় করে," রঞ্জন বললো, "দিদি আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হবেন! আমাদের ছোটো সংসার। আমি, দিদি, আর ওর দুই ছেলেমেয়ে। এ পাড়ায় আর চেনাশোনা কেউ নেই। একা একা দিদির ভালো লাগে না।"

"আপনার মা বাবা কোথায়?"

"ওঁরা মারা গেছেন অনেকদিন।"

"আপনার জামাইবাবু?"

"উনিও বেঁচে নেই।"

দু'জনেই চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, "আসবেন তো একদিন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো। কতো নম্বর ফ্ল্যাট আপনার?"

"সাত নম্বর। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে একটু খানি এগিয়ে ডাইনে পড়বে।"

রঞ্জন চলে যাচ্ছিলো।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো ইজের পরা একটি ছেলে। ছবুলাদের পাশের বাড়ি থাকে।

"ছবুদি, ছবুদি," সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "তুমি এলে এতক্ষণে? শিগ্‌গির এসো, মাসীমার অসুখ বেড়েছে খুব। অজ্ঞান হয়ে আছেন অনেকক্ষণ।"

মাসীমা মানে ছবুলার মা। ছবুলা বাড়ির দিকে পা বাড়ালো, সঙ্গে এলো রঞ্জনও।

ছবুলার মা জ্বরে বেহুঁস হয়ে আছেন প্রায় এক ঘণ্টার উপর। বাবা গিয়েছিলেন ডাক্তার ডাকতে। কিন্তু তাঁকে পান নি। পাড়ার যে ডাক্তার চিকিৎসা করতেন, তাঁকে ডাকবার সাহস পাননি, কারণ ভিজিট দেওয়ার মতো টাকা তাঁর হাতে ছিলো না। অধীর হয়ে ছবুলার প্রতীক্ষা করছিলেন।

সেদিন রঞ্জন থাকায় সুবিধে হোলো খুব। সে-ই বড়ো রাস্তার মোড় থেকে ডেকে আনলো তার এক অল্পবয়েসী ডাক্তার বন্ধুকে। সে ভিজিট নিলো না, কারণ রঞ্জন তার ছেলেবেলার বন্ধু।

অত্যন্ত দুর্বল হার্ট ছবুলার মায়ের।

সে ইনজেক্‌শান দিলো একটি। বললো "ইনজেক্‌শানের দামটা পরে পাঠিয়ে দেবেন।"

ঘণ্টা খানেক পর রঞ্জন উঠে পড়লো।

"আপনার বড্ডো দেরী করিয়ে দিলাম," ছবুলা বললো, "আপনি না থাকলে আজ কী বিপদেই না পড়তাম।"

"আসবেন একদিন," রঞ্জন অনুরোধ জানালো যাওয়ার সময়।

"নিশ্চয় আসবো," উত্তর দিলো ছবুলা, "তবে কালতো দেখাই হবে মীনাদের বাড়ি।"

তার পরদিন ছিলো সোমবার। গরমটা অনেক কম। রোদ্দুর অনেক স্নিগ্ধ।

ছবুলার মায়ের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু ছিলো না। হার্ট দুর্বল। তাই ওরকম মাঝে মাঝে হয়।

সেদিন রিহার্স্যাল ভাঙলো সকাল করেই।

রঞ্জন অনেক বলে ছবুলাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ি। সেখানে ওর দিদির সঙ্গে আলাপ হোলো।

ওর দিদির কাছেই ছবুলা শুনলো যে সংসার চালায় রঞ্জন। ওঁর স্বামী মারা গেছেন নিঃসম্বল অবস্থায়। সেদিন থেকে রঞ্জনই মাথায় তুলে নিয়েছে দিদি আর ভাগ্নেদের ভার। কোন এক অফিসে যেন সামান্য চাকরি করে। অবসর সময় কয়েকটা গানের টিউশানি করে। রেডিও থেকেও মাঝে মাঝে পায় কিছু। তাইতে সংসার চলে যায় কোনো রকমে।

মিনিট পোনেরো গল্প করে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে এলো ছবুলা।

মায়ের পথ্য তৈরী করে যখন দিতে গেল, মা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, "কাল যে ছেলেটিকে দেখলাম, ও কে রে ছবু?"

উত্তর দিতে কান দুটো অকারণ একটু লাল হয়ে গেল।

বললো, "ও ওদিকের বাড়ির একটি ছেলে। ওর দিদিকে আমি চিনি।"

রিহার্স্যালের পর দুজনে এক সঙ্গে বাড়ি ফেরাটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালো।

ফেরার পথে সাধারণ মামুলী কথাবার্তা, সাধারণতঃ গানের বিষয়ে।

উচ্চাঙ্গের গান শেখবার খুব শখ ছিলো রঞ্জনের, কিন্তু নানা কারণে পেরে ওঠেনি। প্রধান কারণ খুব বড়ো ওস্তাদের কাছে গান শেখবার সঙ্গতির অভাব। কলেজের এক বন্ধু ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতো। গান শিখেছিলো তার কাছেই। গলাটি ছিলো অনন্য-সাধারণ মিষ্টি। সুতরাং কলেজের সোশিয়্যালগুলোতে হাততালি আর আরেকটি গাইবার অনুরোধ জুটে যেতো সহজেই।

তারপর এক পরিচিত ভদ্রলোকের সাহায্যে রেডিওতে সুযোগ পেয়ে গেল।

অভিনয়ও ভালো করতো। এ্যামেচার স্টেজে করেছে অনেক-বার, রেডিওতেও প্রোগ্রাম পেয়েছে বার কয়েক।

"বেশ তো, খেয়াল শিখুন না," ছবুলা বললো।

"কার কাছে আর শিখবো? ওস্তাদদের যা রেট আজকাল। আর বড়ো ওস্তাদের কাছে না হলে অন্য কারো কাছে শেখার কোনো মানে হয় না।"

একটু ইতস্তত করে ছবুলা বললে, "দেখুন আমি ওস্তাদ নই। তবে বড়ো ওস্তাদের কাছেই শিখেছি। কিছুই জানি না, তবে সামান্য যেটুকু জানি, সে যদি আপনার কাজে লাগে—"

স্থির হোলো মীনাদের শো-টা শেষ হয়ে গেলে রঞ্জন ছবুলার কাছে গান শিখতে আরম্ভ করবে।

ইতিমধ্যে শো পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল কয়েকদিন।

শো-এর যখন দিন সাত বাকি তখন হঠাৎ একদিন রঞ্জনের দেখা নেই।

রিহার্স্যালের ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হোলো ছবুলার। তারপর নিজের ওপরই নিজে বিরক্ত হোলো সে।

তার পরদিনও দেখা নেই।

বাড়ি ফেরার পথে আনমনে পা-দুটো বাড়ির দিকে না গিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লো।

কালী ম্যানশানের সামনে এসে একবার থামলো।

ভাবলো একটুখানি—যাবে কি যাবে না।

তারপর তর তর করে উঠে গেল অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে।

ঘরের দোর গোড়ায় এসে ডাকলো, "রঞ্জন বাবু!"

"আসুন," উত্তর এলো ক্ষীণ কণ্ঠে।

ঘরে ঢুকে দেখে রঞ্জন শুয়ে আছে তক্তপোশের উপর।

"কী ব্যাপার", জিজ্ঞেস করলো ছবুলা।

শুনলো দিন দুই ধরে ইনফ্লুএঞ্জায় ভুগছে রঞ্জন।

"এমন কিছু নয়," সে বললো আস্তে আস্তে, "কালই সেরে উঠবো। ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গেছে।"

কপালে হাত দিয়ে ছবুলা দেখলো অল্প জ্বর আছে।

"খেলেন কি?"

"কি আবার খাবো? কিছুই খেতে ভালো লাগছে না।"

"দিদি কোথায়?"

তিন চারদিন হোলো, রঞ্জনের দিদি গেছে শ্যামবাজারে এক দূর সম্পর্কের ভাশুরের বাড়ি। আজ-কালের মধ্যে ফিরে আসার কথা।

"বিকেলে খেয়েছেন কিছু?"

"বলছি তো কিছুই ভালো লাগছে না।"

"তাই বলে না খেয়ে থাকবেন?" অনুযোগ করলো ছবুলা।

সোজা চলে গেল রান্নাঘরে।

উনুনটা ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিলো।

একটি চেনা পরিবার থাকতো পাশের ঘরে। তাদের একটি ছেলেকে ডাকিয়ে বিস্কুট আনিয়ে নিলো রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে।

রঞ্জন তখন ভয়ানক ছেলেমানুষ। কিছুই খাবে না সে।

কিন্তু রোগীর পরিচর্যা কি আজ নতুন করছে ছবুলা ?—মিষ্টি কথায় বেশ ভুলিয়ে ভালিয়ে খাওয়ালো রঞ্জনকে।

তারপর সন্ধ্যে হয়ে আসতে উঠে পড়লো।

বললো, "আমি পাশের ঘরের মাসীমাকে বলে যাচ্ছি আপনাকে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবে'খন। যা যা লাগবে বলবেন। আমি আবার আসবো কাল বিকেলে। এবার টেনে একটা ঘুম দিন দেখি। কাল সব ঠিক হয়ে যাবে।"

দরজার বাইরে এক পা বাড়াতেই পিছন থেকে রঞ্জন ডাকলো ঃ

"ছবুলা !"

হঠাৎ দুরদুর করে উঠলো ছবুলার বুক।

থমকে দাঁড়ালো সে।

তারপর ফিরে রঞ্জনের কাছে এসে দাঁড়ালো।

আস্তে আস্তে বললো, "তুমি আমায় নাম ধরে ডাকলে ?"

ছবুলা দোর গোড়া থেকে ফিরে এসে আস্তে আস্তে বললো, "আমায় তুমি নাম ধরে ডাকলে ?"

রঞ্জন ভাবলো সে যদি এখন কিছু বলে ফেলে সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে জ্বরের ঘোরের প্রলাপ বলে সাফাই গাওয়া যাবে কিনা।

ভাবতে ভাবতে কিছু বলাই হোলো না।

ছবুলা বললো, "আজ যাই। কাল আবার আসবো।"

"একটু বোসো," রঞ্জন বললো।

তারপর হঠাৎ খেয়াল হোলো যে ইতি তার হাতের ভিতর এসে গেছে।

ছবুলা হাতটি ছাড়িয়ে নিলো আস্তে

"আরেকটু বসবে না?" রঞ্জন জিজ্ঞেস

"না, বাড়িতে কাজ আছে। যাই এবার,

"একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। বলা হো

চোখ নামিয়ে চুপ করে রইলো ছবুলা।

তারপর বললো, "যাই এবার—।"

"কাজ আছে বাড়িতে? সত্যি সত্যি?"

"অনেক—।"

"কী কাজ?"

"মায়ের পথ্যি তৈরী করা, রান্না করা। তা ছাড়া, বিমল একটি নতুন গান লিখেছে, তাতে সুর দিতে হবে।"

"বিমল!"

রঞ্জনের জ্বরের তাপ যেটুকু নেমেছিলো, তার তিন ডবল চড়ে গেল।

সেকথা ছবুলা জানলো না।

সে চলে গেল।

দিন দুই পর ঘড়িতে পাঁচটা যখন প্রায় বাজে, ছবুলা শুনলো কে যেন তাদের বাড়ির কড়া নাড়ছে।

দরজা খুলে দেখে, রঞ্জন।

"একি তুমি?"

"হ্যাঁ। সম্পূর্ণ সেরে গেছি। তাই ভাবলাম আজ রিহার্স্যালে

য়ার পথে ভাবলাম তোমায় ডেকে নিয়ে
ব।”
া।
ঞস করলো, “এ দুদিন আসো নি কেন?”
য় বললো, “দেখছিলাম না গিয়ে পারি

ছবুলার দিকে।
আস্তে বললো, “শেষ পর্যন্ত যখন স্থির করলাম,
বার যাবোই, তখন দেখি তুমিই এসে গেছ।”
কক্ষণ চুপ করে রইলো রঞ্জন।
তারপর বললো, “এমনি করেই বোধ হয় দুটো মন খুব কাছা-
কাছি হয়ে আসে, না?”
ছবুলা একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।
মীনাদের বাড়ি এসে দেখে, রিহার্স্যাল শুরু হয়ে গেছে।

অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হোলো নিউ এম্পায়ারে।

আশাতীত ভিড়।

টিকিট বিক্রির উদ্যম খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

প্রোগ্রামের তৃতীয় অনুষ্ঠান ব্যালে নাচটি।

অদ্ভুত ভালো হচ্ছে সেই নাচ। অব্যাহত স্তব্ধতার মধ্যে বসে আছে দর্শকেরা। মঞ্চের উপর চঞ্চল পায়ে ঘুঙুর বেজে যাচ্ছে।

মঞ্চের পিছন দিকে সরোদের উপর দ্রুত তান বাজিয়ে যাচ্ছে সুবোধ বোস। দীপকের গীটারের মীড়গুলো মিশে মিশে যাচ্ছে স্পটলাইটের এ রং থেকে সে রং-এ।

তবলার দ্রুত বোলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে প্রত্যেকের হৃদয় স্পন্দন।

উইঙ্‌স্‌-এর ফাঁক দিয়ে মীনা মিত্র একবার উঁকি মেরে প্রেক্ষা-গৃহটি পর্যবেক্ষণ করলো।

নাচ আরো মিনিট সাত আট চলবে। তারপর অমল দত্তের বেহালা। তারপর মীনার নাচ।

মঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে মীনা ফিরে এলো পিছনের গ্রীণ রুমে। বাইরের প্যাসেজে রঞ্জন তখন সিগারেট টানতে টানতে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। কিছুক্ষণ আগে তার আধুনিক বাংলা গান হয়ে গেছে, খুব এন্‌-কোর পেয়েছে দর্শকদের কাছ থেকে। গোটা দুই গান গাওয়ার পর প্রচুর হাততালি নিয়ে উঠতে পেরেছে সে।

গ্রীণ রুমে এসে মীনা দেখে সেখানে অন্যান্য আর্টিষ্টেরা চা আর শিঙাড়া নিয়ে বসে খুব জটলা করছে। এক কোণে একা চুপচাপ বসে আছে বিমল।

মীনা গিয়ে তার কাছে একটি চেয়ার টেনে বসলো।

"একা বসে আছো?"

"হ্যাঁ," বিমল বললো খুব আস্তে।

"কেন?"

"এমনি। তোমার নাচটা দেখবার জন্যেই বসে আছি। তারপর হস্টেলে ফিরবো।"

"পুরো প্রোগ্রামটি দেখবে না?"

"হস্টেলে গিয়ে অনেক নোট তৈরী করতে হবে, মীনা।"

"তা হলে আজ এলেই বা কেন," মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"বললাম তো, তোমার নাচটি দেখতে—।"

"সত্যি, আমাদের জন্যে তোমার অনেক সময় নষ্ট হোলো, না?"

"না, মীনা, কিচ্ছু সময় নষ্ট হয়নি।"

"তুমি গানটি চমৎকার লিখেছো—।"

"বার বার বলে আমায় কেন অপ্রস্তুত করছো, মীনা? গানটা কিচ্ছু হয়নি। ছবুলার অমন চমৎকার গাওয়া আর তোমার অপূর্ব নাচ, এসব মিলে গানটি ভালো শোনাচ্ছে, এই পর্যন্ত।"

"ছবুলা এ গান অসম্ভব ভালো গেয়েছে, তাই না?"

"তুমি অসাধারণ ভালো নেচেছো," বললো বিমল।

কথার মোড় ফেরালো মীনা।

জিজ্ঞেস করলো, "পরীক্ষার প্রিপ্যারেশান কি রকম হোচ্ছে?"

"পাশ করে যাবো হয়তো," বিমল উত্তর দিলো।

"তারপর কি করবে?"

"জানি না। যদ্দিন কিছু না করতে পারি তদ্দিন ল-টা পড়বো।

তবে ল পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়ে উঠবে কিনা জানি না। বছর খানেকের মধ্যে বাবার পেনশান হয়ে যাবে। তার আগে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।"

"তোমাদের জীবনটা বেশ," মীনা বললো, "একটা বড়ো চাকরি করবে, তারপর একটি সুন্দর বৌ—।"

বিমল হাসলো।

বললো, "বড়ো চাকরির মোহ আমার নেই মীনা, আশাও করিনে। আমার কোনো রকমে মোটা ভাত মোটা কাপড়ে চলে গেলেই হোলো।"

একটু চুপ করে রইলো সে। তারপর বললো, "আমার আরো অন্য সব প্ল্যান ছিলো, কিন্তু ওসব বোধ হয় আর হবে না।"

"কি প্ল্যান বিমল ?"

বিমল চুপ করে রইলো।

"বেশ বোলো না। তোমার নিজের ব্যাপার, আমার জেনে কি আর হবে।"

"না গোপনীয় কিছু নয়, মীনা। তোমাদের সঙ্গে আমার এদ্দিনের জানাশোনা। তোমাদের কাছে গোপন করবো কেন ?"

"নাই বা বললে—।"

বিমল হাসলো।

বললো, "রাগ করছো কেন ? শোনো। ভেবেছিলাম নাটক লিখবো। মাঝখানে বাঙলা নাটক অনেক দিন ঝিমিয়ে পড়েছিলো। সম্প্রতি লোকে আবার থিয়েটার পাগলা হয়ে উঠেছে। এদিক ওদিক দুচারটি ছোটো খাটো দল নতুন করে নাট্য-আন্দোলন সুরু করেছে। সুতরাং নতুন নতুন নাটক চাই। সে অন্য ধরণের নাটক, মীনা, এখনকার মতো অন্তঃসারহীন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ডিটেকটিভ

বা ভাবপ্রবণ সামাজিক নাটক নয়। এসব বড্ড খেলো, এর শেকড় বেশী দূর যায় নি। এসব বেশীদিন চলবে না। নতুন যা আসবে সে হবে সাধারণ মানুষের আটপৌরে দৈনন্দিন জীবনের সত্যি-কারের রূপকথা। তুমি তো জানো এ নিয়ে নতুন কিছু চেষ্টা করবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। ভেবেছিলাম নিজেদের একটা ছোটো দল তৈরী করে এই নতুন আন্দোলনের মধ্যে ভিড়ে যাবো।"

"এতো সবই ছবুলার আইডিয়া," মীনা মুখ টিপে হেসে বললো।

মীনার মুখ-টেপা হাসি বিমল লক্ষ্য করেনি।

উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, সে-ই প্রথম এ আইডিয়া আমায় দিয়েছিলো। আমি তো লেখা নিয়ে ছেলেখেলা করতাম। ছবুলাই প্রথম আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে এর অন্য সম্ভাবনা আছে। কিছু করতে পারি বা না পারি কিছু করবার চেষ্টাটি অন্তত করা যেতে পারে। ছবুলা নিজে অভিনয় করে ভালো, আমি নিজেও এক আধটু করতে পারি, গানের ক্ষেত্রেও একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করবার ইচ্ছে ছবুলার ছিলো। ভেবেছিলাম আমরা যখন আছি, আমাদেরই মতো আরো দুচারজন বন্ধুবান্ধবও যখন আছে, তখন চেষ্টা একটা করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে দুএকটা তো করেওছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আর করা যাবে না কিছুই।"

"কেন ?"

মুখ-টেপা হাসিটি মীনার ঠোঁটের প্রান্ত থেকে অন্তর্ধান করেছে ইতিমধ্যে।

"ছবুলা বোধ হয় বেশী দিন থাকবে না আমাদের মধ্যে," বিমল আস্তে আস্তে বললো।

"ছবুলা নাই বা থাকলো," আরো আস্তে আস্তে বললো মীনা।

বিমল তাকালো মীনার দিকে।

মীনা চোখ নামিয়ে নিলো।

দীপক এসে উপস্থিত হোলো।

"এই যে মিনু, তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। অমলের বেহালা প্রায় শেষ হয়ে এলো। রেডি হয়ে নে। এবার তোর নাচ। ছবুলা কোথায়?"

"কি জানি কোথায়, ওকে দেখিনি অনেকক্ষণ," বিমল বললো।

ওপাশ থেকে একজন শুনতে পেয়ে বললো, "ছবুলাকে কিছুক্ষণ আগে একতলায় লবিতে দেখেছি। কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলো।"

দীপক বেরিয়ে গেল গ্রীণ রুম থেকে।

"বিমল!"

"কি। মীনা!"

"ছবুলা নাই বা থাকলো।"

"ও বাদ পড়লে দলটা কানা হয়ে পড়বে—।"

"সংসারে কেউ অপরিহার্য নয় বিমল।"

"আমার গানে সুর দেবে কে?"

মীনা হাসলো।

বললো, "মনে করো যদি আমি দিই—।"

বিমলও হাসলো। তারপর গম্ভীর হয়ে তাকালো মীনার দিকে—।

জিজ্ঞেস করলো, "তুমি?"

"ছবুলার মতো ওস্তাদ নই," মীনা বললো, "কিন্তু গান এক আধটু আমিও শিখেছি।"

বিমল তাকিয়ে রইলো মীনার দিকে।

একটু পরে আস্তে আস্তে বললো, "মীনা! —"

মীনা তড়বড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।

বললো, "এবার আমার নাচ। মনেই ছিলো না। তুমি পালিয়ে যেওনা বিমল। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

এই বলে চলে যাচ্ছিলো।

কিন্তু আবার ফিরে এলো।

বললো, "না, তুমি হস্টেলে যাও বিমল। পড়াশুনো করোগে। পরে কথা হবে, কেমন?"

মীনা চলে গেল।

বিমল চুপ করে বসে রইলো।

বাইরের প্যাসেজে রঞ্জন তখনো পায়চারি করছে।

প্যাসেজময় সিগারেটের টুকরো ছড়ানো।

"এত দুশ্চিন্তা কিসের?" মীনা জিজ্ঞেস করলো। সে তখন আসছিলো এপথ দিয়ে।

"দুশ্চিন্তা?" সচকিত হোলো রঞ্জন, "না, দুশ্চিন্তা নয়। এমনি পায়চারি করছিলাম। কোথায় চললেন। ও, একটু পরেই তো আপনার। যাই, আপনার নাচটি দেখি গে। অডিটোরিয়াম থেকে দেখলেই ভালো হবে, না? হ্যাঁ তাই করি বরং।"

রঞ্জন চলে গেল।

মীনা গেল স্টেজের দিকে।

উইঙ্স্-এর এ পাশে দেখা হোলো দীপকের সঙ্গে।

"ছবুলাকে খুঁজে পাওয়া গেল?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, ও আসছে। তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম। বেহালা শেষ হয়ে এলো বলে। এবার তোর।...আচ্ছা, ব্যাপারটা কি হচ্ছে বল তো?"

"কী ব্যাপার?"

"এই যেমন, ছবুলার কোনো কিছুতে মন নেই। রঞ্জন পায়চারি করছে বাইরে। বিমল থমথমে হয়ে বসে আছে, তোর একটু বেশী রকম খুশি খুশি ভাব।"

মীনা হাসলো।

"সবাই একটু নার্ভাস হয়ে আছে, এই আর কি।"—বলে একটু তাকালো দীপকের দিকে। সে একটু মুচকি হাসলো।

মীনা বলে চললো, "আর লক্ষ্য করেছো কিনা জানিনা, ছবুলা আর রঞ্জন আচমকা দুজনে দুজনকে তুমি তুমি করে কথা বলতে শুরু করেছে।"

"কী সর্বনাশ!" থমকে দাঁড়ালো দীপক।

তারপর বললো, "থাক, ওসব কথা পরে হবে। ইতিমধ্যে দেখিস, প্রোগ্রামটা যেন মাটি না হয়!"

"কী যে বলো! ওরা তুমি তুমি করে কথা বললে আমার প্রোগ্রাম মাটি হবে কেন।"

দীপক কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

বিমল সাহা চুপচাপ বসেছিলো অনেকক্ষণ।

তারপর ফাঁকা গ্রীণ রুম দেখে খেয়াল হোলো, তাই তো, এখন যে মীনার নাচটি হচ্ছে।

উঠে চলে এলো অডিটোরিয়ামে। বাঁয়ে এক কোণে

দরজার কাছে নিজেদের কয়েকজন লোকের ছোট্টো একটি ভিড়।

বিমল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

নাচ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শেষ কলিটা গাইছে ছবুলা—

…দুঃখের পারাবার
মন্থনে উঠে এলো
কে নূতন উর্বশী জনতার—।
শুনি তা'র
মঞ্জীর ;—রিম্ ঝিম্।

স্পট লাইটের নীল আলোয় সত্যি উর্বশীর মতো দেখাচ্ছে মীনাকে—বিমলের মনে হোলো।

ব্যাকগ্রাউণ্ডের আবছা অন্ধকারে মাইকের সামনে বসে তান-পুরোর তারের উপর আঙুল চালিয়ে গান গাইছে ছবুলা, তার দুপাশে অর্কেস্ট্রার অন্য সবাই।

ছবুলার গান, সুবোধ বোসের অর্কেস্ট্রা আর মীনার বিদ্যুতদ্রুত পদসঞ্চার একটা উদ্দাম ঝোড়ো পরিবেশ সৃষ্টি করলো প্রেক্ষাগৃহে।

সামনে ঝুঁকে পড়েছে সবাই। চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। নিঝুম। নিস্পন্দ।

ড্রপসিন পড়তে উন্মত হাততালিতে প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়লো।

বিমলের সামনে যে দাঁড়িয়েছিলো বেরুনোর জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো। বিমল তাকিয়ে দেখে সে রঞ্জন। সেও বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

"অদ্ভুত ভালো নেচেছে মীনা মিত্র," বললো রঞ্জন।

"ছবুলা চমৎকার গেয়েছে গানখানি।" বিমল উত্তর দিলো।

দুজনের মধ্যে কটাক্ষ বিনিময় হোলো।

"গানটি তো তোমারই লেখা," রঞ্জন মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"সে খবর তোমার কাছে নিশ্চয়ই নতুন নয়," বিমল হাসলো একটুখানি।

"তোমার গান যখন, ছবুলা তো ভালো গাইবেই," রঞ্জন বললো।

"সবার গানই ছবুলা ভালো গায়," বিমল উত্তর দিলো।

"ছবুলার দেখছি প্রতিভা খুঁজে বার করবার ক্ষমতা আছে বেশ।"

"তাইতো দেখছি সম্প্রতি।"

রঞ্জন ঠোঁট কামড়ালো একটুখানি।

তারপর বিমলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, "আমি কিন্তু ছবুলার আরেকটি প্রতিভা আবিষ্কার করেছি। ও চমৎকার রান্না করে।"

"তাই নাকি?" নির্লিপ্ত প্রশ্ন বিমলের।

"হ্যাঁ, সেদিন খেয়ে এলাম ওদের বাড়ি। এই তো আজ দুপুরেও খাচ্ছি ছবুলাদের ওখানে।"

"তাই নাকি?" আরেকটি নির্লিপ্ত প্রশ্ন বিমলের।

"তুমি আজ দুপুরে কোথায় খাচ্ছো," রঞ্জন ভিজে বেড়ালের মতো জিজ্ঞেস করলো।

"হস্টেলে," উত্তর দিলো বিমল, "আমাদের ঠাকুরও বেশ ভালো রাঁধে।"

বলে আর উত্তরের অপেক্ষা করলো না।

সোজা চলে গেল অন্য দিকে।

উল্টো দিক থেকে এলো ছবুলা।

এসে জিজ্ঞেস করলো, "কি ব্যাপার? বিমলের সঙ্গে ঝগড়া হোলো না কি?"

"ঝগড়া? না তো, সে হতে যাবে কেন?"

"দেখলাম তোমরা দুজন দুজনকে কি যেন বললে। তারপর ওর মুখ হোলো বাংলা পাঁচের মতো। তোমার মুখ হোলো লক্ষ্মীর বাহনের মতো। সে হন হন করে চলে গেল। আমায় লক্ষ্যই করলো না। কি ব্যাপার বলোতো?"

রঞ্জন বললো, "আচ্ছা ছবুলা, এরা সবাই আমাদের সম্বন্ধে কিছু আঁচ করেনি তো?"

"আমরা কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছি?" ছবুলা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

রঞ্জন বললে, "তা'হলে বোধ হয়—।"

কথাটা শেষ করলো না।

"তাহলে কি?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"বিমলের বোধ হয় হিংসে হয়েছে।"

ছবুলা তাকালো রঞ্জনের দিকে।

জিজ্ঞেস করলো, "তোমার মাথা খারাপ হোলো নাকি? বিমলের হিংসে হতে যাবে কেন?"

"ও তোমায় গান লিখে দিতো। তুমি সুর দিতে—।"

"কি হয়েছে তাতে?"

"এখন যে আমি এলাম।"

"এতে ওর হিংসে হবার কি আছে? এখন থেকে তো আর তুমি আমায় গান লিখে দিচ্ছোনা যে আমি ওর গানে সুর না দিয়ে তোমার গানে সুর দেবো।"

"মনে করো, এখন থেকে যদি আমিই গান লিখি," রঞ্জন বললো।

ছবুলা হেসে ফেললো।

বললো, "তুমি পারবে না।"

একটু গম্ভীর হয়ে গেল রঞ্জন।

তারপর বললো, "চলো, এবার বেরিয়ে পড়ি। তোমার তো আর কিছু করবার নেই।"

"কে বললে আর কিছু করবার নেই। টিকিট বিক্রির হিসেবটা এবার দেখতে হবে। মেয়েদের বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কতো কাজ। শুনছি নাকি আবার একটি গান গাইতে হবে। সবাই খুব বলছে।"

ওরা এগিয়ে গেল কথা বলতে বলতে।

ঘরের ভিতর এককোণে বসে কথা বলছিলো বিমল আর মীনা।

"তুমি হস্টেলে ফিরবে না?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"না। ফিরলেও আর পড়াশুনোয় মন বসবে না," বিমল উত্তর দিলো। "তোমাদের সঙ্গে যতক্ষণ থাকি ভালোই থাকি ততক্ষণ।"

মীনা একটি ঢোক গিললো।

"আমায় কি সব বলবে বলেছিলে," বিমল জিজ্ঞেস করলো।

প্রথমটা মীনার মুখে কোনো কথা এলো না।

ইতস্তত করলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললো, "হ্যাঁ, বলছিলুম কি,—দাদা, সুবোধ বাবু এরা মিলে একটি নতুন ট্রুপ করছে। এর নামকরণ হয়েছে নবনাট্য সংঘ। যদি তুমি আসোতো ভালোই হয়। তাহলে তোমার লেখা একটি নাটক নিয়েই আমরা শুরু করি।"

বিমল মুখ ফিরিয়ে তাকালো মীনার দিকে।

বললো, "আমার নাটক তোমাদের কি পছন্দ হবে? আমার লেখা ছবুলা ছাড়া আর কেউ পছন্দ করে বলে জানতাম না।"

"তোমার কি ধারণা তোমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ছবুলা ছাড়া আর কোনো অনুরক্ত নেই," মীনা জিজ্ঞেস করলো।

কিছুক্ষণ ভাবলো বিমল।

তারপর বললো, "কিছুক্ষণ ধরে তোমায় একটি কথা বলবো ভাবছিলাম। তবে পরীক্ষার আগে বলবো, না পরে বলবো, স্থির করতে পারি নি। এখন মনে হচ্ছে বলেই ফেলি আর অপেক্ষা না করে।"

"না, না, এখন থাক। ওসব কথা পরে হবে," ব্যস্ত হয়ে উঠলো মীনা। "এখানে অনেক লোক। কে কি শুনতে কি শুনবে, কি ভাবতে গিয়ে কি ভেবে বসবে! তুমি বরং—!"

"না, মীনা। এখানে বলে ফেলাই ভালো। বলছিলাম কি, ছবুলার জন্যে একটি নাটক লিখেছিলাম। এখন ভাবছি সেটি তোমাকেই দেবো। তুমি যদি চাও তো সেটি নিতে পারো।"

মীনা মুখ নিচু করে বিমলের কথার অপেক্ষা করছিলো।

এবার যেন একটু অবাক হয়ে চোখ দুটো তুলে তাকালো তার দিকে।

বিমল হাসলো একটু।

আস্তে আস্তে বললো, "সেই নাটকের নায়ক আমি নিজে—।"

একটুখানি কেঁপে উঠলো মীনার বুকখানি।

সে ঘরে এসে ঢুকলো রঞ্জন আর ছবুলা।

রঞ্জন বলছিলো, "শুধু তুমি আর আমি, ব্যস আর কেউ নয়।"

ছবুলা হেসে বললো, "আচ্ছা।"

দেখলো ওপাশে এক কোণে পাশাপাশি ছুটো চেয়ারে বসে আছে মীনা আর বিমল।

ছবুলার চোখ মেয়েদের চোখ।

মীনা আর বিমলের মুখ দেখে আঁচ করলো যে ওদের এদ্দিনকার বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হয়ে আসছে।

ছবুলার মুখের ঝলমলো হাসি বিকীর্ণ হোলো, সেটি বিলিয়ে দিলো বিমলকে।

বিমল সে হাসির প্রত্যুত্তর দিলো একটি ফ্যাকাসে হাসিতে।

রঞ্জনের চোখে পড়লো এই হাসি বিনিময়। তার ভুরু ছুটি কুঞ্চিত হোলো।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল রঞ্জন।

বললো, "কিন্তু এই পরিবেশ তোমায় ছাড়তে হবে ছবুলা।"

ছবুলা বললো, "সে কি করে হয় রঞ্জন। এটা আমি নিজের হাতে গড়ে তুলেছি। এরা সব আমার পুরনো বন্ধু। এদের কি করে ছাড়ি?"

রঞ্জন কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলো।

বললো, "না, না, এদের ছাড়তে বলছি না। শুধু বলছি আমাদের শিল্পী-ত্রিকোণে যোগ দিতে। আরো কতো বেশী স্কোপ পাবে তুমি। আমরা রঙ্গশ্রীর হলটা লীজ নিয়ে একেবারে পেশাদারী স্টেজের মতো সংগঠন করছি।"

"পেশাদারী হতে তো কোনোদিনই চাই নি, রঞ্জন," ছবুলা বললো। "চাইলে অনেক আগেই পারতাম। আমার আদর্শ একটু অন্যরকম। বরং তুমি এসো আমাদের দলে।"

"আমায় এরা কেউ পছন্দ করে না ছবুলা।"

"ওটা তোমার কমপ্লেক্স। আমার বন্ধুরা কেউ অমন নয়।

তোমায় পছন্দ না করলে কেউ তোমায় আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ডাকতো না। তা ছাড়া আমি নিজে যখন তোমায় বলছি, তখন আর কারো আপত্তি থাকতে পারে না। কারণ এরা জানে যে আমি যাকে দলে টানি তার দাম বুঝেই টানি।"

কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে এলো বিমল ও মীনার কাছে। এসে ছবুলা বললো, "এই তো, বিমলকেই জিজ্ঞেস করো না রঞ্জন, তুমি যদি আমাদের দলে যোগ দাও, কী ভীষণ খুশী হবো আমরা সবাই। আমরা জুনের গোড়াতেই একটি নাটক নামাচ্ছি।"

বিমল কিছু বলার আগেই মীনা উত্তর দিলো, "রঞ্জন আমাদের দলে যোগ দিলে আমরা খুব খুশী হবো। আমার মনে হয় পুলকেশের ভূমিকায় রঞ্জনকে বেশ মানাবে।"

"পুলকেশের ভূমিকা ওকে দেবো কেন," ছবুলা জিজ্ঞেস করলো। "পুলকেশ চরিত্রটির মোটে সাড়ে সাত লাইন ডায়ালগ তিনটি সিন মিলিয়ে।"

"হ্যাঁ, ওর মুখে বিমল কয়েকটি গান দিয়েছে। সুতরাং রঞ্জনকে সেই চরিত্রে খুব মানাবে।"

"না, রঞ্জনের জন্যে সেই রোল নয়। শুধু গান গাইবার জন্যে হলে অনেককে পাওয়া যাবে।"

"তা হলে ওকে আর কোন রোল্-এ দেবে?" মীনা জিজ্ঞেস করলো, "নিখিলের ভূমিকায় তো বিমল নিজে নামছে।"

"কেন, মৃগাঙ্কর ভূমিকায়!"

"বিমল সেই চরিত্রটি বাদ দিয়েছে।"

"কেন?"

"ওই চরিত্রটি বাদ দিলে নাটকটি আরো ভালো জমবে—।"

"কে বললে সে কথা?"

"আমাদের তো তাই ধারণা—।"

মীনার কথায় যেন প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বের আভাস পেলো ছবুলা। তার কথার উত্তর দিলো না। ঘুরে দাঁড়ালো বিমলের দিকে ফিরে।

জিজ্ঞেস করলো, "মৃগাঙ্কর চরিত্র বাদ দিলে কেন বিমল ?"

বিমল কোনো উত্তর দিলো না।

রঞ্জন বললো, "বইটা কি বিমলের লেখা ?"

"বিমলের লেখা বই ছাড়া আর কারো বই তো আমরা অভিনয় করি না রঞ্জন।" মীনা উত্তর দিলো।

রঞ্জন ঠোঁটটা একটু কামড়ালো। তারপয় সামলে নিয়ে বললো, "এ বইটি নিয়ে যখন এত মতভেদ, তখন এ বই থাক না। আমি অন্য বই এনে দিচ্ছি।"

মীনা একটু হেসে ঘাড় নাড়লো।

ছবুলা বললো, "বিমল, নাটকের প্লটটা তোমায় আমিই দিয়েছিলাম।"

বিমল মীনার দিকে তাকালো। তারপর বললো, "ভাবছি, প্লট বদলে একটু অন্য রকম করে লিখবো।"

"তোমার কি ধারণা তাতে বইটি আরো ভালো হবে ?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"হওয়ারই তো কথা," মীনা উত্তর দিলো !

"তুমি থামো মীনা," ছবুলা বললো, "আমি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করি নি।"

"বিমলও ওই একই কথাই বলবে," মীনা মুখ টিপে হেসে বললো।

ছবুলা তাকালো দুজনের দিকে।

"এসব কথা থাক ছবুলা," রঞ্জন বললো, "এ বইতে নামবার ইচ্ছে আমার খুব নেই। চলো বাড়ি যাই এবার—।"

"দাঁড়াও," ছবুলা বললো। তারপর ঘুরে দাঁড়ালো বিমলের দিকে। "দেখ বিমল, প্লটটা আমিই দিয়েছিলাম। তুমি বেশ ভালো করে লিখেওছিলে। কিন্তু তুমি যখন নতুন করে লিখতে চাও তো বেশ, তাই লিখো। নামাও সে বইটি। তবে আমার ধারণা আগের বইটিই স্টেজে ভালো জমবে। তুমি যখন আমার কথা বিশ্বাস করছো না তখন হাতে হাতে প্রমাণ করে না দিলে তো তুমি বুঝবে না। চিরকাল আমার বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করে এসেছো। আজ কি হোলো বলো তো? যাই হোক, তোমরা তোমাদের নতুন বইটি করো, আমি রঞ্জনকে নিয়ে আলাদা ভাবে তোমার প্রথম বইটি করছি।"

"কিন্তু বিমলের বইতে আমি তো নামবো না," বললো রঞ্জন।

"কেন নামবে না শুনি," ছবুলা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস্ করলো। "তুমি কি জানো না, কি অসাধারণ একখানি চরিত্র সে সৃষ্টি করেছে মৃগাঙ্কর মধ্যে? বিমল যে কতো ভালো লেখে সে নিজেই জানে না। আমি বলে না দিলে সে কোনোদিন জানতেও পারতো না। অন্য লোকের কথায় ভুলে সে যে নিজের ভালো লেখাকে নষ্ট করবে তা তো আমি হতে দিতে পারি না। বিমল আমার হাতের তৈরী।"

রঞ্জনের মুখের উপর দিয়ে আরেক ঝাঁক কালো মেঘ ভেসে গেল।

বললো, "ওরা তোমায় বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে ছবুলা।"

ছবুলা মাথা নাড়লো।

"না, আমাকে নয়। ওরা বাদ দিতে চাইছে তোমাকে। ওরা তোমায় ডেকে এনেছিলো গান গাইবার জন্যে। কিন্তু তোমার মধ্যে

কতোখানি অভিনয়ের প্রতিভা আছে সে তো এরা জানে না। বিমলের লেখা নাটকে তোমার অভিনয়ের ছোঁয়া পড়লে সে যে কী দাঁড়াবে সে এরাও জানে না, তুমিও জানো না।"

"ছবুলা, তুমি আমাদের দল থেকে আলাদা হয়ে নতুন বই নামাবে ?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

ছবুলা উত্তর দিলো, "তোমাদের জন্যেই আমায় কিছুদিনের মতো আলাদা হয়ে যেতে হচ্ছে মীনা। বিমল যে কী জিনিস তৈরী করেছে তোমরা বুঝলে না। বেশ বিমলকে নিয়ে তোমরা অন্য যা খুশী করো। আর আমিও দেখি, বিমলের যে লেখাটি তোমরা অপছন্দ করছো, তাকে আমি কিসে দাঁড় করাতে পারি।"

গানের শেষ প্রোগ্রাম ছিলো ছবুলার।

দীপক ডাকতে এলো।

"এরপরও তুমি গান গাইবে ছবুলা," রঞ্জন বললো।

"ছেলেমানুষি কোরো না রঞ্জন," বলে ছবুলা চলে গেল।

ফুটলাইটে মুখ ঝলমলিয়ে আড়ানায় একটি রাগপ্রধান ধরেছিলো ছবুলা।

—"আমার বসন্ত আসে
বিকেল বেলার
ধূলোর দুরন্ত ঝড়ে……"

উইঙ্‌স্‌-এর পাশে দাঁড়িয়েছিলো মীনা, বিমল, রঞ্জন—সবাই। গানের ভাষা শুনে রঞ্জন হেসে ফেললো।

বিমলকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার লেখা ?"

বিমল ঘাড় নাড়লো।

ছবুলা তখন অন্তরার উচ্চগ্রামে চলে গেছে—

রঞ্জন হেসে মন্তব্য করলো, "তোমার নইলে এমন বিদ্‌ঘুটে ভাষা আর কার হবে।"

বিমল আস্তে আস্তে শুধু বললো, "আমার লেখা গান গাইতে ছবুলার ভালো লাগে।"

রঞ্জন কোনো উত্তর দিলো না।

শুধু একটি চলতি কালো ছায়া ভেসে গেল ওর মুখের উপর দিয়ে।

শো যখন ভাঙলো তখন একটা প্রায় বাজে।

নিদাঘ মধ্যাহ্নের ঝাঁঝাঁলো রোদ্দুরে তখন হুমায়ুন প্লেসের পিচ ঢালা রাস্তা তেতে উঠেছে।

পথে নেমে বিমল মীনাকে বললো, "চলো, এখানে কাছাকাছি কোথাও খেয়ে নিই। তারপর তিনটে নাগাদ একটি সিনেমা দেখা যাবে।"

"কেন, হস্টেলে ফিরে যাবে না তুমি," মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"হস্টেলের ভাত এতক্ষণে বরফ হয়ে গেছে। সে আর খাওয়া যাবে না।"

চৌরঙ্গির উপর একটি রেস্তরাঁয় গিয়ে ঢুকলো ওরা দুজনে।

অর্ডার দিলো বয়কে।

তারপর বিমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, মীনা, ওরকম একটা ছেলেমানুষি না করলে চলতো না?"

"কি ছেলেমানুষি?"

"মিছি মিছি চটিয়ে দিলে ছবুলাকে। আমি তো সত্যি সত্যিই মৃগাঙ্কর চরিত্রটা বাদ দিই নি। নাটকটা নতুন করে ঢেলে সাজবার কোনো প্ল্যানও করিনি।"

"বুঝতেই পারছো, রঞ্জনকে এড়ানোর জন্যেই বললাম সে কথা," মীনা উত্তর দিলো।

"কিন্তু ছবুলাও যে সরে যাচ্ছে—।"

"দেখ বিমল," মীনা বললো, "রঞ্জনদের জন্যে যে সব ছবুলারা সরে যায়, তাদের জন্যে কোনো মমতা না থাকাই ভালো। আমাদের

কাজ, সে অনেক বড়ো বিমল। ওদের জন্যে সেটা আটকাবে না।”

“কাজ ?” বিমল ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো।

মীনা হাসলো একটুখানি।

তারপর বললো, “তুমি অনেকক্ষণ আগে আমায় একটি কথা বলেছিলে। শুনে আমি মনে মনে একটু হেসেছিলাম বিমল। তখন কিছু বলিনি। তোমার ইচ্ছে, বাংলা নাটকে একটি নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করা, যাতে আমাদের ঝিমিয়ে-পড়া নাটকে একটি নতুনত্ব আনা যায়।কিন্তু বিমল, তোমার কি মনে হয়নি যে নাটক ও রঙ্গমঞ্চ আরো বড়ো, আরো ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যম হতে পারে ?”

কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুনে গেল বিমল।

মীনা বলে গেল, “দুনিয়াটা বদলে যাচ্ছে বিমল। সাধারণ মানুষ ক্রমশ সজাগ হয়ে উঠছে তার চারদিকের অবস্থা সম্বন্ধে। আজ সে শান্তিতে থাকতে চায়, আরো ভালো ভাবে থাকতে চায়, যারা তাদের শান্তিতে থাকা, আরো ভালোভাবে থাকায় বাধা দিতে চায় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে, তাদের ঝেঁটিয়ে সাফ করতে চায় সমাজের বুক থেকে। মানুষকে আরো সচেতন করে তুলতে হবে বিমল। একদল সে চেষ্টা করছে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির ভেতর দিয়ে। আমরা আরেক দল সে কাজ আরম্ভ করছি সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মারফতে। মানুষের আশা, আকাঙ্খা, কামনা সব কিছুর নতুন প্রকাশ দরকার লেখা, ছবি আর অভিনয়ের মাধ্যমে। আমরা নিয়েছি নাটক, অভিনয়, গান। দাদা, ছবুলা, আমি—আমরা সবাই এ উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের দলটি গড়েছি। যদিও এত সব তুমি জানো না, তবু ছবুলা তোমায় আমাদের মধ্যে নিয়ে এসেছিলো তোমার লেখার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী আছে, তার সঙ্গে আমাদের মিল

দেখে। নাটক, অভিনয়, গানকে শুধু অবসর সময়ের ছেলেখেলা মনে করবার দিন আর নেই বিমল,—একে কাজে লাগাতে হবে।"

বিমল আনমনে উত্তর দিলো, "ছবুলা যে আমাদের ছেড়ে যাবে ভাবতে পারিনি।"

"আবার ওর কথা কেন," মীনা জিজ্ঞেস করলো!

পর্দা সরিয়ে বয় এসে ঢুকলো ভাত আর মাংসের ডিশ নিয়ে।

বিমল কাঁটা আর চামচে তুলে নিলো।

তারপর বললো, "ছবুলা আমায় বেশ গাইড্ করতো।"

মীনা হেসে বললো, "কেন, ও না হলে তুমি জীবনে কিছু করে উঠতে পারবে না?"

বিমল গেলাস তুলে নিয়ে জল খেলো এক চুমুক।

তারপর তাকালো মীনার দিকে।

দেখলো মীনার মুখে হাসি ঝিলমিল করছে।

বিমল আস্তে আস্তে বললো—

"হাসিতে তোমার গালে টোল পড়ে,
শুধু সে'টুকুর জন্যে
এনে দিতে পারি বিপ্লব দেশে—
ওগো গৃহস্থ কন্যে!"

ওদের হাসির দমকা হাওয়ায় কেবিনের নীল পর্দা দুলে দুলে উঠলো।

টালিগঞ্জের ট্রামে একটি সীটে পাশাপাশি বসেছিলো ছবুলা আর রঞ্জন।

কারো মুখে কোনো কথা নেই।

ছবুলা ভাবছিলো হঠাৎ কি হয়ে গেল গত কয়েকদিনের মধ্যে।

বেশ তো ছিলো আগেকার দিনগুলো। নিজের ছোটো সংসার নিয়ে, কলেজের হাল্কা জীবন নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাট দিনগুলো কাটাচ্ছিলো সে। তারপর কোত্থেকে এসে উপস্থিত হোলো রঞ্জন।

কয়েকদিন আগেকার সন্ধ্যেগুলোর কথাই ভাবছিলো ছবুলা।

জানলার বাইরের শ্যামলা ময়দানের ওপাশে পর পর পেরিয়ে যাচ্ছিলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, ক্যাথিড্র্যাল…।

"কি ভাবছো, ছবুলা!"

কোনো উত্তর দিলো না সে।

একটু পরে ফিরে তাকালো সে। দেখলো রঞ্জনও আনমনা।

জানলো না যে সেই সন্ধ্যার কথা ভাবছে রঞ্জনও।

এলগিন রোড পেরিয়ে গেল.—জগুবাজার—পূর্ণ—হাজরা পার্ক—কালীঘাট…।

"কি ভাবছো রঞ্জন!"

রঞ্জন একটু চমকে উঠলো।

তারপর হেসে বললো, "তোমার কথাই ভাবছি।"

সারাটা পথ আর কোনো কথাবার্তা হোলো না এদের মধ্যে। মীনা আর বিমলের সঙ্গে ছবুলার তর্ক কি রকম যেন একটু আড়ষ্ট করে ফেলেছিলো এদের দুজনকে।

কিন্তু বাড়ির কাছে এসে ট্রাম থেকে নামতেই কেটে গেল সেই আড়ষ্টতা।

দুপুরের গুমোট গরম কাটিয়ে এরই মধ্যে দক্ষিণের হাওয়া ঝির ঝির করতে শুরু করেছিলো পথের দুপাশের গাছে গাছে।

ছবুলার বাড়িতে রঞ্জনের খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিলো।

বাড়ি ফিরেই ছবুলা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো, আর রঞ্জন গিয়ে

বসলো রান্নাঘরের দরজার চৌকাঠে। তারই ফাঁকে নানারকম গল্প।

ছবুলার মায়ের ঘরে শিবপদবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ছেলেটি কে?"

"ও রঞ্জন। তোমার মনে নেই? সেদিন যখন আমার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিলো সে খুব সাহায্য করেছিলা।"

"ও হ্যাঁ। কি করে ছেলেটি?"

"খুব ভালো গান গায়। আর চাকরি করে কোথায় যেন। ছবুলা আজ ওকে এখানে খেতে বলেছে।"

"তাই নাকি?"

একটু গম্ভীর হলেন শিবপদবাবু। ক্ষুণ্ণও হলেন একটুখানি।

বললেন, "কই, আমায় তো একবারও জানায় নি।"

"ও ঘরের ছেলে, এখানে খাবে, তার জন্যে আর তোমায় আগের থেকে বলে না রাখলেই বা কি? খাচ্ছে তো ঝোলভাত, এমন কিছু আয়োজন তো করতে হয়নি যে তোমায় আগের থেকে বলে ভালো করে বাজার করিয়ে আনতে হবে।"

"তা বটে," শিবপদবাবু উত্তর দিলেন, "বাজার করবার টাকা যদি আমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার দরকার হোতো তা হলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। সে যাক, ছবুলাকে বলো, আমার খাবার আগে এঘরে দিয়ে দিতে। আমায় একটু বেরোতে হবে।"

আগে আগে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন শিবপদবাবু।

ছবুলা অতো সব লক্ষ্য করলো না।

শুধু দীর্ঘনিশ্বাস চাপলেন ছবুলার মা।

রঞ্জনকে খাইয়ে ছবুলা নিজে খেয়ে নিতে নিতে আকাশে মেঘ

করে এলো। ঝড়ের আভাস দেখা দিলো আবার। মেঘে মেঘে অন্ধকার ঘন হয়ে নামলো।

তারপর ঝমঝম করে বৃষ্টি।

মাকে একদাগ ওষুধ খাইয়ে ছবুলা ফিরে এলো।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলো তানপুরোটি পেড়ে রঞ্জন তারের উপর আঙুল বুলোচ্ছে।

"বেশ গান গাইবার আবহাওয়া," রঞ্জন বললো।

"গাও না একটা, শুনি।"

"মায়ের অসুবিধে হবে না তো?"

"কিছু না। এখন তো বেশ ভালো আছেন। আমি গাইছি না সব সময়? মা ভয়ানক গান ভালোবাসেন।"

"আধুনিক বাংলা গান কি তোমার ভালো লাগবে?"

"আগে শুনি তো! তারপর দেখা যাবে ভালো লাগে কি না লাগে।"

"বেশ, হারমোনিয়ামটি বার করে দাও—।"

"হারমোনিয়াম? হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইবে?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।"

ছবুলা বাক্স থেকে হারমোনিয়াম বার করে দিলো।

খুব আস্তে আস্তে গান ধরলো রঞ্জন, তার ভরাট মিষ্টি গলায়—।

যবে নেমেছিলো বরিষণ
আঁখিতে মম,
কোন দিশাহারা সমীরণে
মোর বিরহ ব্যাকুল মনে

আসিল বারতা তব
হে প্রিয়তম.........

নিজের গানের আবেগে নিজের চোখই ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছিলো রঞ্জনের, হঠাৎ সে চোখ দুটো কপালে উঠলো।

আর গান বন্ধ হোলো সঙ্গে সঙ্গে।

দেখলো, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ছবুলা খুক খুক করে হাসছে।

গান থামতে ওর হাসি আরো প্রবল হয়ে উঠলো।

"হাসছো যে?"

হাসির ফাঁকে ফাঁকে ছবুলা বললো, "ও গান থাক, বরং রবীন্দ্রনাথের গানই একটি গাও শুনি।"

"কেন, এ গান কী দোষ করলো?"

"এসব আধুনিক গানের ভাষা শুনলে আমার হাসি পায়," ছবুলা উত্তর দিলো। "সেই বাঁধা বুলি, ঘুরে ফিরে প্রত্যেক গানেরই একই ভাষা,—মম আঁখিতে বরিষণ, সুতরাং দিশাহারা সমীরণ, তখন মনকে বিরহ ব্যাকুল হতেই হবে, সমীরণেরও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই সে তব বারতা আনবেই, আর মম-র সঙ্গে মেলাতে হলে প্রিয়তম ছাড়া গত্যন্তর নেই।—তুমি আমায় যে কোনো আধুনিক গানের যে কোনো লাইন বলো রঞ্জন, আমি ঠিক বলে দিতে পারবো পরের লাইনটি কি। আচ্ছা, এসব প্রাগৈতিহাসিক—যবে, মোর, আসিল, তব,—এসব কথা ব্যবহার না করে গান লিখতে পারো না তোমরা?"

"গানের সুরটি ভালো," রঞ্জন মুখ কালো করে বললো গানটির স্বপক্ষে অন্তত একটি যুক্তিও দেখানোর প্রচেষ্টায়।

"থাক, হয়েছে, সুরের কথা আর বলতে হবে না। একবার কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত, তারপর আবার কোমল নি, শুদ্ধ ধৈবত আর শুদ্ধ নি—গান কি ছেলেখেলা না কি? কি সুর বাব্বাঃ,"

বলে নিজের গলায় ব্যঙ্গের ছোঁয়া এনে সুর তুললো, "সা নি্ সা পা…হ্মা পা দা পা…মা পা মা গা…গা মা ণি ধা নি র্সা… —এসব কি ইয়ার্কি, না কি? আবার চড়ার সা-তে গিয়ে গলা কাঁপানো হচ্ছে!"

"দেখ ছবুলা, মিশ্র সুরে ওরকম এক আধটু—"

"থামো, আমায় আর মিশ্র সুর বোঝাতে হবে না। মিশ্র সুরেও কি জিনিস করা যায় শুনবে? তা হলে—কি গাওয়া যায়?—হ্যাঁ, একটি দেশমল্লার শোনো।" তানপুরো তুলে নিলো ছবুলা, "দেশ রাগটির সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু জানো। খাম্বাজ ঠাটের রাগ, রে বাদী, পা-সম্বাদী। আরোহনে 'গা' লাগে না, শুদ্ধ 'নি' লাগে, অবরোহনে কোমল 'নি'। যেমন, সা রে মা পা নি র্সা, র্সা ণি ধা পা মা গা রে গা সা। আচ্ছা, এখন এর বিশেষ তান হোলো—রে মা পা ণি ধা পা, মা গা রে, রে গা সা। এসব জানো নিশ্চয়ই। এখন, দেশমল্লারকে কোনো পৃথক রাগ বলা যায় না। দেশ রাগের মধ্যে জায়গায় জায়গায় মল্লারের ছায়া দেখালেই সেটি হয়ে যায় দেশমল্লার। যেমন,— রে গা সা, গা সা রে মা পা, মা পা নি র্সা—। র্সা রে´ নি সা´, রে´ ণি ধা ণি পা, মা পা ণি ধা পা, মা পা মা গা রে গা সা। গা সা রে মা পা—। বুঝলে তো?"

এমনি করে ছবুলা আরোহী, অবরোহী আর সুরের নানা রকম বিন্যাস গেয়ে বুঝিয়ে দিলো রঞ্জনকে, আর তৈরী গলায় মায়াময় সুরের ছোঁয়া রঞ্জনের মনে মনে জমে-ওঠা রাগ জল করে দিলো।

"এবার দেশমল্লারে একটি গান শোনো, তারপর সেটি তুলে নেওয়ার চেষ্টা করো—।"

রঞ্জন চুপচাপ বসে গান শুনলো ছবুলার ঃ

বর্ষা রাতে—

দমকা হাওয়ার সাড়া অন্ধকারে

রিম্ ঝিম্ আবছায়াতে।

বৃষ্টির ছাটে জানলার শার্সি ঝাপসা হয়ে এলো। বাইরে জল-কাদা ছিটিয়ে একটি গাড়ি চলে গেল। তারপর নিস্তব্ধ, থমথমে চারদিক। শুধু জানলার শার্সিতে একটানা বৃষ্টির শব্দ, তবলায় ঠেকা দিয়ে যাওয়ার মতো,—আর গানের সম থেকে আড়-কুয়াড় বোল তুললো মেঘে মেঘে গুরু গুরু আওয়াজ। তারই মধ্যে ছবুলার গান—

নিঝুম শহরতলি ঝড়ের কোলে
কি ঘুম বঁধুর চোখে উপোসী রাতে
নিথর ঘুমে বুঝি
সোনালী দিনের রাঙা স্বপ্ন নামে—

একটু মুচকি হাসলো রঞ্জন। তারপর দেখে কখন সে গলা মিলি-য়েছে ছবুলার সঙ্গে—

আঁধার থর থর বৃষ্টি ঝর ঝর
এমন ঘুমঘন
বর্ষা রাতে…।

বাইরে তখন ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি,…কী ভীষণ বৃষ্টি।

এমনি করে কেটে গেল আরো কয়েকটি সন্ধ্যা।

ছবুলার কাছ থেকে শুদ্ধমল্লার, মিঞামল্লার, গোড়মল্লার, নট-মল্লার, আর মেঘমল্লার, এই পাঁচ রকম শিখে নিলো রঞ্জন।

তারপর ছবুলা বললো, "আরো অনেক রকম মল্লার আছে, যেমন সুরদাসী মল্লার, চর্জুকী মল্লার, মীরাবাঈকী মল্লার, রূপমঞ্জরী, রাম-দাসী মল্লার, তা ছাড়া ঝাঁঝ মল্লার, অরুণ মল্লার, ধুরিয়া মল্লার। এগুলো আজকাল আর চলে না। তার উপর একই জিনিস আবার অন্য নামেও দেখা যায় যেমন সুরট মল্লার, সাওয়ানী মল্লার ইত্যাদি।"

"চলে না কেন?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

"দেখ, সা রে মা পা নি সা, এই কয়টি স্বরের উপর নির্ভর করছে মল্লার, কানাড়া আর সারং। এর মধ্যে কয়েকটি রাগ আসাওয়ারি ঠাটে, আর বাদ বাকি যারা কোমল গা আর শুদ্ধ ধা ব্যবহার করে ওরা কাফি ঠাটে। এই ঠাটে এত রাগ যে সবারই পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। বিস্তার করবার জায়গা নেই। তাই এর অনেকগুলোই আজকাল আর চলে না।"

"এই সবগুলো শিখতে হবে?"

"দেখ, রঞ্জন," ছবুলা বললো, "যে কোনো একটা রাগ শিখতে অনেক দিন সময় লাগে। আমি তোমায় শুধু প্রত্যেকটা রাগের সঙ্গে চেনা করিয়ে দিচ্ছি, তারপর একটা একটা করে শেখাতে শুরু করবো। সুতরাং যে কটা মল্লার চিনলে, সে যথেষ্ট। বাকীগুলো দরকার নেই। পরে যখন এগুলো আয়ত্ত হবে, অন্যগুলোও এসে যাবে সহজেই।"

"এবার কি শোনাবে?"

"জয়জয়ন্তী।"

জয়জয়ন্তী সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় লাভ করলো রঞ্জন।

তারপর গারা।

তারপর মালগুঞ্জ।

যেদিন মালগুঞ্জের একটি গান তুলছিলো, ঝগড়া হোলো সেদিনই।

"বুঝলে? রাগেশ্বরী, বাগেশ্রী, গারা ইত্যাদি মিলিয়ে এই রাগ। তা হলেও এর একটি নিজস্ব রূপ দাঁড়িয়ে গেছে," রঞ্জনকে বোঝাচ্ছিলো ছবুলা। "এর আরোহী অবরোহী হোলো এরকম—

র্সা গা মা ধা ণি র্সা, ... সা ণি ধা মা পা গা মা জ্ঞা রে সা ...।"
তারপর সুরের নানারকম বিস্তার আর তান ইত্যাদি দেখিয়ে একটি গান ধরলো ছবুলা।

গানটি শেষ করে ছবুলা বললো, "জানো, তোমায় এদ্দিন বলা উচিত ছিলো। এ কয়দিন যা যা গান শুনলে সব বিমলের লেখা। আর সুর দিয়েছি আমি।"

হঠাৎ টং করে সেতারের তার ছিঁড়ে যাওয়ার মতো কি যেন ছিঁড়ে গেল রঞ্জনের মনে।

মাধুর্যের রেশ কেটে গিয়ে তিক্ততার দহন অনুভূত হোলো।

খুব ধারালো চড়া গলায় বললো, "সেদিনকার এত সব ব্যাপারের পরও বিমলের নাম তুমি মুখে আনছো? বিমল ছাড়া আর কেউ গান লেখে না এ দেশে?"

হঠাৎ চড়া গলা শুনে অবাক হয়ে ছবুলা মুখ তুলে তাকালো।

"কি হোলো তোমার?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো, "কোন ব্যাপারের কথা বলছো?"

"বিমল সেদিন এরকম অপমান করলো তোমায়—"

"অপমান?" ছবুলা হাসলো। "ও, এই ব্যাপার? কিন্তু ওসব কথা ওরা তো ওরকম কিছু ভেবে বলেনি। ওরা আমার বন্ধু, আমায় ওরা যা বলেছে, সে আমি একটি চ্যালেঞ্জ বলে নিয়েছি। আমার জন্যে বিমল যে নাটকটি প্রথমে লিখেছিলো সেটি অনেক ভালো হয়েছে, সেটা বদলে সে যা করেছে তার থেকে। সে কথাই ওকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে তোমায় নিয়ে আমি আলাদা ভাবে মঞ্চস্থ করবো ওর নাটক, এ কথাই তো ওকে বলে এসেছি।"

ছবুলা দেখলো রঞ্জন চুপ করে আছে। কোনো কথা বলছে না।

তখন বললো, "রঞ্জন, এ ছুদিনের ব্যাপার। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এ নিয়ে কিছু ভেবো না। বিমলটা বড্ড ছেলেমানুষ। ওর মধ্যে জিনিস আছে। শুধু ওকে একটু গাইড করতে হয়। ছুদিন পর আমরা সবাই আবার—"

ছবুলার কথা শেষ হওয়ার আগেই রঞ্জন উঠে পড়লো।

বললো, "বেশ, তোমার বিমলকে নিয়ে তুমিই থাকো। আমি চললাম।"

"কী ছেলেমানুষি করছো রঞ্জন ?"

রঞ্জন এগুলো দরজার দিকে।

"রঞ্জন, শোনো—।"

রঞ্জন শুনলো না।

বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অবাক হয়ে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো ছবুলা।

তারপর দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে সেতারটি তুলে নিয়ে নিজের মনে টুং টাং করে বাজাতে শুরু করলো।

সেই মালগুঞ্জ সুরটাই—।

কতোক্ষণ বাজিয়েছিলো খেয়াল নেই।

হঠাৎ দেখে বাইরে জানলার পাশে দীপক দাঁড়িয়ে আছে।

"একি ? তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ?"

ছবুলা গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

ভেতরে এলো দীপক।

"তারপর ? হঠাৎ এদ্দিন পর ?"

"খবর নিতে এলাম। তোমার তো দেখা নেই। পুরনো বন্ধুদের যেন ভুলেই গেলে এই কদিনেই। কী ব্যাপার বলো তো ?"

"কিচ্ছু না। তবে, মায়ের শরীর ভালো নেই। তাই বাড়ি থেকে বড়ো একটা বেরোই না," ছবুলা উত্তর দিলো।

দীপক ভালো করে তাকিয়ে দেখলো ছবুলাকে।

তারপর একটু হাসলো।

কি জানি কেন, বড্ড অপ্রস্তুত বোধ করলো ছবুলা। সেটি কাটিয়ে উঠবার জন্যে জিজ্ঞেস করলো, "চা খাবে দীপক?"

"খাবো না? আলবৎ খাবো।"

চা করতে গেল ছবুলা।

মীনাদের বাড়ি।

চওড়া বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে গল্প করছিলো মীনা, বিমল আর সুবোধ বোস।

বিমলের পরীক্ষা আরম্ভ হতে আর মাসকয়েক বাকি। পড়ার ভাবনা থেকে মনকে অবসর দিতে সে এখানেই আসতো প্রত্যেক দিন বিকেল বেলা। খুব হাল্কা গল্প গুজব করে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে চলে যেতো।

এরা তখন নিজেদের নাট্য প্রতিষ্ঠান নতুন ভাবে গড়ে তুলছে। তবে বিমল সে বিষয়ে কোনো আলোচনা করতো না ওদের সঙ্গে। তার মন এখন এম-এ পরীক্ষার পড়ার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকা দরকার। তার জন্যে কোনো কাজও আটকে ছিলো না। প্রাথমিক কাজগুলো সব মীনা আর দীপক মিলে শুরু করে দিয়েছিলো অন্য সবাইকে নিয়ে।

"খুব চেপে পড়াশুনো করছেন তাহলে," সুবোধ বোস জিজ্ঞেস করলো।

"পড়াশুনো আর হচ্ছে কোথায়," বিমল বললো, "এখনো অনেক বাকী। স্পেশিয়্যাল পেপারগুলো এখনো ছোঁয়াই হয়নি।"

এমন সময় দীপক এলো।

এসে একটি চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলো।

বসে বললে, "ওহে, একটি মস্তো খবর আছে।"

সবাই কথা বন্ধ করে তাকালো তার দিকে।

"আমায় এক কাপ চা দিতে পারিস কিনা ভাখতো মীনু," সে বললো মীনাকে।

"চায়ের জল চড়ানো হয়েছে। চা আসছে একটু বাদে। খবরটা কি ?"

"বলছি দাঁড়া। চা-টা আস্তুক।"

"চা তো আসছেই। শুনিই না খবরটা কি।"

"ছবুলার সঙ্গে রঞ্জনের ঝগড়া হয়েছে।"

মীনা বিমলের দিকে তাকালো।

বিমল সামলে নিলো মুখের ভাবান্তর।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, "ওদের যে বনবে না সে আমি আগেই জানতাম।"

"কি হয়েছে বলো তো ?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"ছবুলাদের বাড়ি গিয়েছিলাম," দীপক বললো, "পথে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা। ছবুলার খরর জিজ্ঞেস করতে সে মুখের যা ভাব করলো সেটা আর যাই হোক রোমান্টিক নয়। তারপর ছবুলার ওখানে গিয়ে দেখি সে চুপচাপ বসে সেতার বাজাচ্ছে। কোনো হুঁশ নেই। ওকে তো চিনি। ওর বাজনা শুনে বুঝলাম যে ওর মন ভালো নেই। রঞ্জনের কথা জিজ্ঞেস করতে বললো ও কোনো খবর রাখে না। তারপর চা করে খাওয়ালো, নানারকম গল্প করলো, কিন্তু যতোবারই রঞ্জনের কথা তুললাম, এড়িয়ে গেল। তাতেই বুঝলাম যে একটা কিছু হয়েছে।"

"ছবুলার মতো মেয়ে যে রঞ্জনকে বেশীদিন সহ্য করতে পারবে না সে তো জানা কথা," বললো স্থবোধ বোস।

"যাক গে। ওদের মধ্যে যা হবে হোক। আমাদের কী দরকার মাথা ঘামিয়ে," মীনা উত্তর দিলো, "বিমল কি বলো ?"

“মাথাটা বড্ডো ধরেছে,” বিমল বললো, “বহুদিন সুবোধবাবুর সরোদ শুনিনি। একটা ভালো কিছু বাজান তো শুনি।”

মীনা একটু হাসলো।

“আমার সরোদটা তো এখানে নেই। তার চেয়ে বরং দীপকের গীটার শোনা যাক।”

চা এলো।

চায়ের ধোঁয়ায় আর গীটারের সুরে আর গোধূলির ম্লান আলোয় পৃথিবীটা যেন আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল তাদের কাছ থেকে!

হঠাৎ বাজনা থামিয়ে দীপক বললো, “আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি।”

সবাই তাকালো তার দিকে।

“ছবুলা বড্ড একা পড়ে যাবে। ওকে আবার ডেকে নিয়ে আসা যাক আমাদের মধ্যে। ও না হলে আমাদের কি করে চলবে।”

বিমল চোখ বুঁজে বসেছিলো এতক্ষণ, চায়ের পেয়ালা তখনো নিঃশেষ হয়নি। কাপটা পাশে রেখে উঠে দাঁড়ালো।

বললো, “এবার উঠি। রাত হয়ে আসছে।”

মীনা হেসে ফেললো।

বললো, “কথাটা উঠতেই বুঝি ছবুলার বাড়ি ছুটলে?”

বিমল একটু অপ্রস্তুত হোলো।

বললো, “না, না, তা নয়। আমি হস্টেলেই ফিরছি।” তারপর সামলে নিয়ে বললো, “কথাটা যখন উঠলোই তখন বলেই ফেলি। দেখ, ওর সঙ্গে তোমাদের মনান্তর আমাকে নিয়েই হয়েছে। সুতরাং তার কাছে আমারই আগে যাওয়া উচিত।”

“বোসো বিমল,” মীনা আস্তে আস্তে বললো।

বিমল তাকিয়ে দেখলো মীনা কখন গম্ভীর হয়ে গেছে।

সে আবার বসে পড়লো।

"তুমি খুব ভালো করেই জানো বিমল, যে মনান্তর তোমায় নিয়ে নয়, রঞ্জনকে নিয়ে। সে কথা আমরা বুঝতে দিতে চাইনি বলেই তোমায় উপলক্ষ্য করে গোলমালটা হোলো।"

বিমল কোনো উত্তর দিলো না।

মীনা জিজ্ঞেস করলো, "রঞ্জন সম্বন্ধে কিছু জানো বিমল ?"

বিমল ঘাড় নাড়লো।

মীনা বললো, "রঞ্জনের আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপই ছিলো কিছুদিন আগে পর্যন্ত। তার চাকরির যা মাইনে, সে এমন কিছু নয়। কিন্তু সম্প্রতি তার হাতে কিছু পয়সা আসতে আরম্ভ করেছে। সেটা সে বাইরের কাউকে অবশ্যি বুঝতে দিতে চায় না। এ পয়সা কিসের জানো ?"

দীপক একটু হেসে গীটার বাজাতে শুরু করলো আস্তে আস্তে।

"যুদ্ধের পর কলকাতায় অনেক কিছুর র‍্যাকেট, অনেক ধাপ্পা-বাজি শুরু হয়ে গেছে। তারই মধ্যে একটি হোলো চ্যারিটি শো-এর র‍্যাকেট। চ্যারিটির নাম করে শো দেখিয়ে টাকা তুলে তারপর সেখানে খরচার অঙ্কটা ফাঁপিয়ে লাভটা চুরি করে পকেটে পোরা— এই হোলো এ ব্যবসার মূলতত্ত্ব। রঞ্জন এবং আরো তিন চারজন লোক মিলে এই করছে আজ ছমাস ধরে। ওদের মূলধন, রঞ্জনের সংগঠন। এ পর্যন্ত তিনটে শো করেছে। রঞ্জনের নামেই হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা। সুতরাং বাইরের লোক সন্দেহ করে না।"

বিমল বললো, "কিন্তু তোমাদের শো-তে তোমরাই তো তাকে ডেকে এনেছিলে।"

"ও দাদার বন্ধু। দাদাই এনেছিলো। আর তখন পর্যন্ত এ

খবর আমরা জানতাম না। খবরটা শিল্পী সংঘের এক কমিটি মেম্বার মারফত পেলাম আমাদের শো-র আগের দিন। তখন চারদিকে ওর নাম জানানো হয়ে গেছে, তাই দেখলাম ওকে তক্ষুনি সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই ওকে আমরা তারপর থেকে এড়িয়ে চলছি।”

বিমল চুপ করে একটু ভাবলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা, এসব ব্যাপার ছবুলা জানে ?”

“জানে বলে মনে হয় না,” মীনা বললো। “আমরা যখন জানলাম তখন দেখলাম ছবুলাকে বলা নিরর্থক হবে। সে বিশ্বাস করবে না আমাদের কথা। কারণ তদ্দিনে ওদের অন্তরঙ্গতা অনেক গভীর হয়ে গেছে। যদ্দিন সে নিজের থেকে না জানবে তদ্দিন আমাদের গায়ে পড়ে কিছু জানানোয় কোনো কাজ হবে না। তবে ভেবো না, তার জানতে বেশী দেরি হবে না। ছবুলাকে আমরা তো জানি। সে যতোই ভালোবাসুক রঞ্জনকে, এসব জানলে সে কোনো সম্পর্ক রাখবে না ওর সঙ্গে। সেদিন সে নিজের থেকেই ফিরে আসবে আমাদের মধ্যে।” একটু থেমে বললো, “আর আমাদের দরজা তো সব সময় খোলাই আছে ছবুলার জন্যে।”

“তুমি বলতে চাইছো ছবুলা আর রঞ্জনের এই মনোমালিন্য সাময়িক ?” বিমল জিজ্ঞেস করলো।

“কি জানি, ব্যাপারটা তো কিছুই জানা নেই,” মীনা উত্তর দিলো, “তবে আমার মনে হয় এ খুব একটা সাধারণ মান অভি-মানের ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। একটা কথা ভুলে যাচ্ছো কেন, রঞ্জন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ছবুলার সঙ্গে ভাব করেছে। অন্তত আমার তাই ধারণা। গাইয়ে হিসেবে ছবুলার যে সুনাম আছে

তার অনেক আর্থিক সম্ভাবনা আছে, যদি রঞ্জন তাকে কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং সামান্য একটু ঝগড়াতেই সে ছবুলার সম্পর্ক ছাড়বে না।"

"তাহলে তুমি বলতে চাও, রঞ্জন ফিরে আসবে ছবুলার কাছে?"

মীনা হাসলো।

বললো, "না। ছবুলাই ফিরে আসবে রঞ্জনের কাছে। ভুলে যাচ্ছো কেন, সে-ই রঞ্জনের প্রেমে পড়েছে, রঞ্জন ওর প্রেমে পড়ে নি।"

মীনা থামলো।

দীপক গীটার বাজিয়ে চললো।

বিমল বললো, "কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। ছবুলার মতো মেয়ে কি করে রঞ্জনকে ভালোবাসতে পারে!"

"এ একটা সাময়িক মোহ, একে তুমি ভালোবাসা বলছো কেন বিমল?"

"কিন্তু ছবুলার মতো মেয়ের মোহই বা হবে কেন?"

"ছবুলা রক্তমাংসের মানুষ, সে কথা ভুলে যাচ্ছো কেন বিমল?"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বিমল উঠে পড়লো।

ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো মীনা।

দরজা বন্ধ করবার আগে বললো, "বিমল, একটা কথা বলবো তোমায়? এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মন খারাপ কোরো না।"

বিমল চলে গেল।

দিন দুই পর, ছবুলাদের বাড়ি যেই রাস্তায়, সেই রাস্তার মোড়ে বড় রাস্তার উপর ট্রাম স্টপে বিমল ট্রাম থেকে নামলো।

তারপর দাঁড়িয়ে একটু ভাবলো।

মীনা মানা করেছিলো ছবুলার কাছে যেতে।

ভাবলো, থাক, ফিরে যাই।

তারপর ভাবলো, না, এসে যখন পড়েছি, তখন একবার দেখা করে যাই ছবুলার সঙ্গে।

পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

দেখে রঞ্জন ঢুকছে গলির ভিতর।

বিমল একটি পানের গুমতির কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালো, সিগারেট কিনলো, পান কিনলো।

রঞ্জন তাকে লক্ষ্য করলো না। আস্তে আস্তে ঢুকে পড়লো গলির ভিতর।

বিমল ভাবলো, ট্রাম ধরে হস্টেলে ফিরে যাই।

কিন্তু কি ভেবে সেও গেল রঞ্জনের পিছন পিছন।

দেখলো ছবুলাদের বাড়ির দরজা খোলা।

পাশের জানলা দিয়ে রঞ্জন একটু উঁকি মারলো।

তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতর।

বিমল আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো জানলার পাশে। বুঝলো এ কাজ উচিত হচ্ছে না তার পক্ষে, তবু ফিরে যেতে পারলো না।

ভেতরে আনমনে একটি ঠুংরি ধরেছে ছবুলা, কেউ যে ঘরে ঢুকেছে খেয়াল নেই।

রঞ্জন পিছনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

প্রথম কথা বললো রঞ্জন।

অস্ফুট শোনা গেল বাইরে থেকে।

"আমিই এলাম ছবুলা," রঞ্জন বললো।

ছবুলা মুখ ফিরিয়ে রঞ্জনকে দেখে একটু হাসলো।

বললো, "আমি জানতাম তুমি আসবে। এসো, ভেতরে এসো।"

রঞ্জন ভেতরে ঢুকে পাটির উপর বসলো।

বাইরে তখন গাঢ় সন্ধ্যা। বিমলকে কেউ লক্ষ্য করলো না।

বিমল দেখলো যে ছবুলার চোখ রঞ্জনের উপর মেলে দেওয়া।

সে চোখ সন্ধ্যাতারার মতো স্নিগ্ধ।

বিমল সরে এলো জানলা থেকে।

তারপর পথ ধরে এগিয়ে চললো মোড়ের দিকে।

"একি, তুমি এখানে ?"

চমকে উঠলো বিমল।

তাকিয়ে দেখে মীনা।

"তুমি এখানে যে ?" বিমল উল্টে জিজ্ঞেস করলো।

মীনা হাসলো।

বললো, "যাচ্ছিলাম ছবুলার কাছে। তোমায় ফিরে আসতে দেখে মনে হচ্ছে, গিয়ে লাভ নেই। ছবু নিশ্চয়ই বাড়ি নেই।"

বিমল একটি ফ্যাকাসে হাসি হাসলো।

"কিংবা আছে হয়তো," মীনা আবার হাসলো, "কিন্তু তুমি ভাবলে এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না। তুমি যে জানলা দিয়ে কিছুক্ষণ উঁকি মেরে দেখে ফিরে আসছো, সেটা লক্ষ্য করেছি।"

বিমল কোনো উত্তর দিলো না।

"চলো, বাড়িই ফিরি তাহলে," মীনা বললো, "এসো, হেঁটে যাই একটুখানি। তারপর ট্রামে চাপা যাবে। ট্রামে বাসে যা ভিড় !"

অনেকক্ষণ পাশাপাশি পথ চললো ওরা দুজন।

কারো মুখে কোনো কথা নেই।

তারপর প্রথম স্তব্ধতা ভাঙলো মীনা।

বললো, "আমায় না বলে এলে কেন, বিমল ? আমি না মানা করেছিলাম।"

বিমল কোনো উত্তর দিলো না।

মীনা আস্তে আস্তে বললো, "জানো বিমল, আজ অন্য কেউ হলে আমি রাগ করে চলে যেতাম। বলতাম, তোমার সঙ্গে কথা বলবো না। কিন্তু তোমার বেলায় সেটা পারলাম না। তোমায় তো চিনি। তোমার সঙ্গে কথা বলবো না বললে তুমি হয় তো প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করবে, তবু কিছুতেই যেচে কথা বলতে আসবে না আমার সঙ্গে।"

বিমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আমার উপর রাগ করেছো, মীনা ?"

মীনা কোনো উত্তর দিলো না।

আস্তে আস্তে নিজের হাতখানি সঁপে দিলো বিমলের হাতের মধ্যে।

কিছুক্ষণ পর আবার কথা বললো মীনা।

গলাটা তার ধরে গেছে।

বললো, "আমার একটি কথা রাখবে বিমল ? ছবুলার কথা ভেবে মন খারাপ কোরো না।"

বিমল কোনো উত্তর দিলো না।

হাত চেপে ধরলো মীনার।

তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ পথ চললো দুজনে।

তাদের পেরিয়ে ডাইনে বাঁয়ে পাশ কাটিয়ে গেল অনেক লোকজন, গাড়ি ঘোড়া ট্রাম—আর পাশ কাটিয়ে গেল দীপক।

কিন্তু ওরা কিছুই লক্ষ্য করলো না।

হঠাৎ একটু হাসলো বিমল।

মীনা চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো।

বিমল বললো, "তোমার হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে মীনা। সেকথা হঠাৎ মনে পড়লো।"

"কোন কথা ?"

"তুমি না বলেছিলে রঞ্জন ফিরে যাবে না ছবুলার কাছে, রঞ্জনের কাছেই ফিরে যাবে ছবুলা। দেখলাম, ঠিক তার উল্টো-টাই হয়েছে। রঞ্জনই ছবুলার কাছে এলো।"

একটু চুপ করে থেকে মীনা বললো, "তার চাইতেও বড়ো ভুল হয়ে গেছে আমার হিসেবে। আমি ভাবতে পারি নি যে তুমি ছবুলার সঙ্গে দেখা করতে আসবে আমায় না জানিয়ে। কিন্তু তাও তো হোলো।"

একটুখানি ছায়া নামলো বিমলের মুখে।

সেটি কাটিয়ে নিয়ে বললো, "অনেকক্ষণ হাঁটা হয়েছে। এসো এবার ট্রামে চাপা যাক।"

বিমল আর মীনার পাশ কাটিয়ে গেল দীপক।

কিন্তু সেও তাদের লক্ষ্য করেনি।

সেও কি যেন ভাবছিলো নিজের মনে।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সেও ঢুকে পড়লো ছবুলাদের গলির

ভিতর। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ছবুলাদের বাড়ির কাছে এলো।

তারপর খোলা জানলা দিয়ে ভেতরটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়ালো।

দেখলো ছবুলা আর রঞ্জন খুব গল্প করছে আর হাসছে।

একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল সে।

জানলার কাছ থেকেই ফিরে এলো।

মোড়ের কাছে এসে ট্রাম ধরলো।

তিনটে স্টপ পরে দেখলো সেই ট্রামে উঠছে বিমল আর মীনা। ওরা তাকে দেখতে পেলো না। সেও ডাকলো না ওদের।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে বিমল আর মীনা নেমে গেল।

দীপক নামলো না সেখানে।

আরো একটি স্টপ এগিয়ে নামলো।

তারপর সেখান থেকে হাঁটতে লাগলো বাড়ির পথ ধরে।

রঞ্জন বললো, "ছবুলা, তুমি মিছিমিছি আমায় ভুল বুঝে কষ্ট পেয়েছিলে। আমি একথা কোনোদিন ভাবিনি যে বিমল সম্পর্কে তোমার কোনো দুর্বলতা আছে। তোমায় আমি বিশ্বাস করি ছবু।"

ছবুলা হাসলো একটুখানি।

রঞ্জন বলে গেল। "আমি জানি যে তোমার যেটুকু দুর্বলতা সে বিমলের লেখা সম্পর্কে।"

"তা হলে সেদিন ওভাবে চলে গেলে কেন?"

"সেদিন? আমার কিসে মনে লেগেছিলো জানো? যেটুকু সময় তোমার আর আমার একলার তার মধ্যে কেন অন্য কারো প্রসঙ্গ এসে আমাদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করবে।"

"তুমি বিমলকে পছন্দ করো না, না?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"পছন্দ অপছন্দ কোনোটাই করি না ছবু।"

"বিমলের লেখা?"

"সেটা সত্যিই পছন্দ করি না। বড্ড কাঁচা লেখা। এখনো অল্প বয়েস, ভালো হবে কি করে। ওর লেখা গানের ভাষা অত্যন্ত উদ্ভট, আবোল তাবোল মনে হয় আমার। ওর লেখা নাটক তুমি যেটি আমায় সেদিন পড়ে শুনিয়েছিলে, ওর মধ্যে আমি কোনো ড্রামা পাইনি।"

ছবুলা আস্তে আস্তে বললো, "রঞ্জন, যে ধরনের নাটক আমার দরকার, বিমলের নাটকটি যে ঠিক তাই, এ সহজ কথাটি তুমি বুঝতে চাইছো না কেন?"

রঞ্জন উত্তর দিলো, "সে তর্ক আজ করবো না ছবু। দিন পনেরো পর আমাদের শিল্পী-ত্রিকোণের প্রোগ্রাম কমিটির একটি মিটিঙ হবে। সেখানে তুমি যদি সবাইকে বোঝাতে পারো, আর সবার যদি মত হয়, তাহলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। হোলো তো? এখন ওসব কথা থাক। অন্য কথা বলা যাক কেমন।"

"কি কথা বলবে?" ছবুলা হেসে বললো।

"এই যেমন—আচ্ছা, বলো তো এই কয়েকদিনে রোজ কতো গ্যালন চোখের জল ফেলেছো তুমি?"

"এক ফোঁটাও নয়," ছবুলা সহজ হবার প্রচেষ্টায় হাল্কা হাসি হেসে বললো, "তুমি কতো ঘনফুট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলে?"

"এ কয়দিন প্রত্যেকদিন রাত্তিরে খুব ঝড় উঠছিলো, লক্ষ্য করো নি?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

খুব হাসলো, রঞ্জন, ছবুলা, দুজনেই।

শিল্পী-ত্রিকোণের প্রোগ্রাম কমিটির মিটিঙে ছবুলাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল রঞ্জন। ছবুলা সাদর অভ্যর্থনা পেলো সেখানে। কিন্তু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলো প্রথম থেকেই। মিটিঙ যাঁর বাড়িতে তিনি এদের একজন পৃষ্ঠপোষক। নাম অমর চ্যাটার্জি। গায়ের জামাকাপড়ে, কথাবার্তার পালিশ করা কৃত্রিমতায়, বাড়ির আসবাবপত্রে পয়সার প্রাচুর্য দেখানোর মনোভাব।

রঞ্জন বললো, "ইনি এঁর এক বন্ধুর লেখা নাটকের কথা বলছিলেন—।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো আপনার কাছে শুনেছি। লেখাটা এনেছেন?" জিজ্ঞেস করলো অমর চ্যাটার্জি।

ছবুলা বিমলের লেখা নাটকের পাণ্ডুলিপিটা এগিয়ে দিলো।

অমর চ্যাটার্জি সেটি উল্টে পাল্টে দেখলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কি নাম বললেন?"

"ওখানে লেখাই আছে। জীতেনবাবুর সংসার—।"

একটু নাক সিঁটকালো অমর চ্যাটার্জি।

তারপর বললো, "নাটকের নাম জিজ্ঞেস করিনি। নাট্যকারের নাম জিজ্ঞেস করেছি।"

"বিমল সাহা।"

"সাহা? আচ্ছা! কি করেন ভদ্রলোক?"

"এবার এম-এ দিচ্ছে," ছবুলা উত্তর দিলো।

"ও, তাই বলুন। একেবারে নতুন। তাই ভাবছিলাম, নাম কোনোদিন শুনিনি, কে হতে পারে এ ভদ্রলোক? তবে ভরসা করে

স্থির করতে পারলাম না যে আমি নাম না শুনলেও ভদ্রলোক নাম-জাদা নন, কারণ লেখাপড়া তো বেশীদূর করিনি, অনেক বড়ো বড়ো লেখকের নামই শুনি নি। তবে আপনি যখন বলছেন, লেখাটা নিশ্চয়ই ভালো। আমরা নিশ্চয়ই আপনার মতামতে আস্থা রাখতে পারি।"

ছবুলা একটু আশান্বিত হোলো। তাকালো রঞ্জনের দিকে।

রঞ্জন তখন চলতি সিলিং-ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন গুনবার চেষ্টা করছে ফ্যানের দেখা না যাওয়া ব্লেডগুলো।

"কিন্তু অসুবিধেটা কোথায় জানেন মিস গাঙ্গুলী?" অমর চাটার্জি বলে চললো, "নতুন লেখকের নতুন নাটক স্টেজ করলে লোকে পয়সা দিয়ে আসবে কেন?"

ছবুলা উত্তর দিলো, "এর আগে ওর একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। বেশ লোক হয়েছিলো।"

"কোথায় করেছিলেন?"

"খিদিরপুরে—।"

চাটুজ্যে তাকাল অন্য সবার দিকে। একটু মুচকি হাসলো।

তার পাশে বসেছিলেন আরেকজন মহিলা। বসন ভূষণ প্রসাধনের অনুপাতে বয়েসটা একটু বেশী। তাঁর চোখের চাউনি ছবুলার ভালো লাগেনি। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় জেনেছিলো যে ইনি একটি মেয়েদের ক্লাবের সেক্রেটারি। শো নামাতে হলে যে কয়টি মেয়ের দরকার হয়, ইনিই নাকি খুঁজে আনেন।

মহিলাটি বললেন, "আমাদের শো নিউ এম্পায়ারে—।"

"নিউ এম্পায়ারে শো আমরাও করেছি," ছবুলা উত্তর দিলো।

"কিন্তু বিমলের লেখা নাটক কোনোদিন করো নি। যা করেছো সে নাচের শো। আর্টিস্টদের নামে আর চেনাশোনাদের প্রভাবে টিকিট বিক্রি হয়েছে," রঞ্জন বললো।

"কিন্তু দীপকেরা তো ওর নাটক শিগ্‌গিরই নিউ এম্পায়ারেই নামাচ্ছে," ছবুলা বললো।

"বেশ তো! আগে ওটা হয়ে যাক," চাটুজ্যে উত্তর দিলো, "একটু নাম হোক বিমল সাহার। তারপর আমরাও নিশ্চয়ই ওর একখানা নাটক নামাবার চেষ্টা করবো।"

টেবিলের অন্য পাশে বসেছিলো একজন শৌখিন অবাঙালী ব্যবসায়ী। মনোহরদাস তার নাম, এদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

এবার সে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, মিস গাঙ্গুলী, ও ভদ্র-লোকের নাটকে নাচ গানের স্কোপ কিরকম আছে?"

নাচ গান! ছবুলা একটু নড়ে বসলো।

"গান আছে তিন চারটে," উত্তর দিলো আস্তে আস্তে, "তবে নাচের কোনো স্কোপ নেই।"

"তাহলে তো হয় না।"

"কেন?"

"আমরা শো করছি একটি হসপিট্যাল ফাণ্ডের জন্যে। লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে দেখতে আসবে এণ্টারটেনমেণ্টের জন্যে। নাটকে মোট তিন চারটে গান থাকলে আর একটিও নাচ না থাকলে এণ্টারটেনমেণ্ট পাবে কোত্থেকে?"

"নাচ না থাকলে এণ্টারটেনমেণ্ট হয় না?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

হাসলো অমর চাটুজ্যে।

বললো, "হবে না কেন, হয়। অনেকে অনেক কিছুতে এণ্টার-

টেনমেণ্টপায়। কেউ ফিলসফি পড়ে পায়, কেউ বেদ পুরাণ বাইবেল পড়ে পায়—তবে আমাদের মতো সাধারণ লোক আনন্দ পায় নাচ গান বাজনা থেকে। তাই এবার আমরা একটি মিউজিক্যাল ড্রামাই নামাবার চেষ্টা করছি।"

"আর সে জন্যেই তো আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে খুব খুশী হয়েছি," বললো মনোহরদাস, "আমরা চাই নতুন নতুন আর্টিস্ট, ফ্রেশ আর্টিস্ট, এ্যামেচার আর্টিস্ট, যারা আর্টিস্ট পয়সা কামাবার জন্যে নয়, আর্টিস্ট আমাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে। আর এ্যামেচার আর্টিস্টদের মধ্যে আপনার এত নাম। আপনার রেডিও প্রোগ্রাম তো আমি প্রায়ই শুনি, আপনার দু-তিনখানা রেকর্ডও আমার বাড়িতে আছে।"

কি রকম যেন ফাটা ঘণ্টার মতো মনোহরদাসের গলা। তার কথায় কান দিলো না ছবুলা।

অমর চাটুজ্যের দিকে ফিরে উত্তর দিলো, "শুধু গান বাজনা দিয়ে নাটক জমানো যায় না অমরবাবু। ড্রামার মধ্যে ড্রামা না থাকলে সেটা কিছুই হয় না শেষ পর্যন্ত।"

"আমরা যে বই নামাচ্ছি তাতে প্রচুর ড্রামা আছে, ছবুলা," বললো রঞ্জন।

"কার বই ?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"বিরূপাক্ষ চক্রবর্তীর 'শায়েস্তা খাঁ'। খুব নাম করা বই।"

ছবুলা একটু হাসলো। হ্যাঁ, ভদ্রলোকের নাম আছে বটে।

"হাসলে যে !" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, "ওর নাম শোনো নি ?"

"হ্যাঁ, শুনেছি," সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো ছবুলা।

"নিশ্চয়ই শুনেছেন, কেন শুনবেন না," অমর চাটুজ্যে বললো, "এতবড়ো একজন নামকরা ড্রামাটিস্ট। পেশাদারী বোর্ডে ওর কতো

বই নামানো হয়েছে। অতো বড়ো নাট্যকার আমাদের দেশে এখন আর কেউ নেই। কি বলেন?"

"নিশ্চয়ই," ছবুলা উত্তর দিলো, "অতো নাটক রবীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীয়ারও লেখেন নি। ওঁর বইয়ের বিজ্ঞাপনে তো দেখি যে উনি এ পর্যন্ত পঁচাশিখানা নাটক লিখেছেন। এত নাটক যে লিখতে পারে সে মস্তো বড়ো নাট্যকার বই কি?"

রঞ্জন তাকিয়ে দেখলো ছবুলাকে।

জিজ্ঞেস করলো, "কেন ওঁর নাটকগুলোর কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই?"

"কিচ্ছু না।"

"কেন?"

"ওগুলো নাটক নয় বলে।"

"কেন নাটক নয়?"

"জীবনের সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে। কতোগুলো টাইপ চরিত্রকে অসম্ভব ঘটনার মধ্যে এনে দাঁড় করিয়ে, তাদের মুখে কতকগুলো অবাস্তব সংলাপ দিয়ে মেলোড্রামা সৃষ্টি যা হয়, সেটা নাটক নয়, সেটা শুধু থিয়েটার," ছবুলা উত্তর দিলো।

"কিন্তু সবাই তো তাঁকে বড়ো নাট্যকার বলে মানে," বললো মনোহরদাস।

"সেটা তাঁর লেখা নাটকের সংখ্যার জন্যে, বোর্ডের সাফল্যের জন্যে আর বিজ্ঞাপনের জন্যে—নাটকের সাহিত্যিক মূল্যের জন্যে নয়।"

"কিন্তু জানেন," বললো অন্য মহিলাটি, "পূর্বাচল থিয়েটারে তাঁর বই সাতশো নাইট চলছে?"

"সেটা এমন একটা কিছু নয়," ছবুলা উত্তর দিলো, "একশো

রাত কোনো রকমে চালিয়ে দিন, তারপর সেই একশো রাত কেন চলেছে শুধু সেটি দেখে আসবার কৌতূহলেই লোকের ভিড় হতে হতে এক হাজার রাত চলে যাবে। পূর্বাচল থিয়েটার বিজ্ঞাপনে মাসে কতো টাকা খরচা করে জানেন? বিরূপাক্ষ বাবুর বই যে প্রথম একশো রাত ক্ষতির উপর চলেছে সে আমিও জানি, আপনারাও জানেন।"

"লোকে কি শুধু কেন চলছে সেটি দেখবার জন্যেই যাচ্ছে?" অমর চাটুজ্যে জিজ্ঞেস করলো।

"শুধু সেজন্যে নয়। যাচ্ছে, নাম করা আর্টিস্টদের অভিনয় দেখতে।"

"তাহলে অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছে বলুন।"

"নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে সেটা নাট্যকারের প্রতিভায় নয়, আর্টিস্টদের প্রতিভায়। বাঙলাদেশে স্টেজ-আর্টিস্টদের পুতুলের ভূমিকায় নামিয়ে দিলেও ওরা সেই চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে পারে। বাঙলাদেশে থিয়েটার চলে নাট্যকারের জন্যে নয়, চলে বাঙলাদেশের লোক থিয়েটার দেখতে ভালোবাসে বলে আর বাঙলাদেশের আর্টিস্টেরা অসাধারণ অভিনয় করতে পারে বলে।"

"সে জন্যেই তো আমরা বিরূপাক্ষবাবুর নাটকই নামাতে চাই," মনোহরদাস হেসে উত্তর দিলো, "বিরূপাক্ষবাবুর নাম আছে, ওঁর লেখা নাটকে ভালো ভালো ডায়ালগ আছে, নাচ আছে, গান আছে, লোকে এসব দেখতে ভালোবাসে। তাই ওরা পয়সা খরচা করে শো দেখতে আসবে।"

"শায়েস্তা খাঁ বইটিতে তো নবাব দরবারের ব্যালে নাচই আছে আটটা, আর গান আছে প্রত্যেক সীনে," অমর চাটুজ্যে বললো।

"আর কী ডায়ালগ," বললো মনোহরদাস, "শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।"

ছবুলা রঞ্জনের দিকে তাকালো।

রঞ্জনও সায় দিয়ে বললো, "সত্যি, ভদ্রলোকের ক্ষমতা আছে সংলাপ লিখবার। এক এক জায়গায় যা ভাষা সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা হয় না।"

"ওই বুড়িগঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে শায়েস্তা খাঁ যে কথাগুলো বলছে, সেগুলো মনে আছে আপনার?"

"সে ভোলা যায় কখনো?"

"মিস গাঙ্গুলী বোধ হয় বইটি পড়েন নি!"

"শুনিয়ে দিন না মিস গাঙ্গুলীকে। ওই রোল তো আপনিই করছেন—।"

"শোনো ছবুলা। শায়েস্তা খাঁ প্রথম বাংলায় এসেছে সুবেদার হয়ে। যেখানে সীন আরম্ভ হচ্ছে সেখানে দেখছি বুড়িগঙ্গার পাড়ে একটি গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটিকে বেঁধে শায়েস্তা খাঁ আস্তে আস্তে দর্শকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। তার পাশে মনসুর। নদীর ওপার থেকে ভৈরবী সুরে বাঁশী শোনা যাচ্ছে। শায়েস্তা খাঁর মুখের উপর উইঙস্‌-এর ওধার থেকে স্পট লাইট পড়ছে, প্রথমে লাল, তারপর সবুজ, তারপর নীল। তখন শায়েস্তা খাঁ বলছে :—মনসুর, মনসুর, কী অপূর্ব, কী নয়নমনোহর এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাঙলার শোভা! কী অতুলনীয় এর সৌন্দর্য! আমি ইরাণ, তুরাণ, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি নানাদেশ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এদেশের মতো সুষমাময়ী, মাধুর্যময়ী, বিচিত্ররূপিণী দেশ কোথাও দেখিনি। এর শ্রাবণমেদুর মেঘগম্ভীর গগনমণ্ডলে চকিতা বিজলীর লাস্যময়ী চপলতা, স্নিগ্ধ শারদ প্রভাতে দিগন্ত বিস্তৃত শস্যশ্যাম শিশিরসিক্ত

ধানক্ষেতে মন্দ মন্দ পবনের স্পর্শবিহ্বল মদীরতা, রজনীগন্ধার সৌরভ-উদ্বেল বসন্ত নিশীথে তিমিরঅবগুণ্ঠিতা তামসী রজনীর আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ তারকার রজতনিন্দিত দ্যুতি, কলকণ্ঠ তটিনীর বীচিক্ষুব্ধ বক্ষে ভাসমান রজততরণীর মতো চন্দ্রিমার দোদুল্যময় প্রতিফলন, এ আর কোথাও কোনোদিন দেখেছো মনসুর, কোথাও তুমি দেখেছো? আহা, এত শান্তিময় এদেশের লোকের জীবন, এত হাসি, এত আনন্দ, এত পরিতৃপ্তি, এত সুখ এদের জীবনে, এত সম্পদ, এত ঐশ্বর্য, এত প্রাচুর্য—আর কোনো দেশে আছে মনসুর? এদের গোলাভরা ধান, এদের পুকুর ভরা মাছ—”

ছবুলা আস্তে আস্তে বললো, “দেশের চারদিকে অভাব অনটন। লোকে পেট ভরে খেতে পায় না রঞ্জন, কতো লোকের চাকরি নেই, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর সংস্থান নেই—এর মধ্যে তুমি এই সংলাপ শোনাবে?”

রঞ্জনের অভিনয় সবাই অভিভূত হয়ে শুনছিলো।

ছবুলার কথা শুনে ছবুলার দিকে ফিরে তাকালো।

কয়েক মুহূর্ত চারদিক স্তব্ধ, সবাই নির্বাক।

তারপর রঞ্জন আস্তে আস্তে টেনে নিলো বিমলের নাটকের পাণ্ডুলিপি। দুচারপাতা উল্টে গিয়ে এক জায়গায় এসে থামলো।

তারপর বললো, “আচ্ছা, এখান থেকে পড়িয়ে শোনানো যাক। শুনুন।—দ্বিতীয় দৃশ্য। জীতেনবাবুর বসবার ঘর। জীতেন-বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তক্তপোশে বিছানো ছেঁড়া মাদুরের উপর। পিছনে জানলা খোলা। দুতিনজন ভিখারী আস্তে আস্তে হেঁটে গেল বাইরের পথ দিয়ে। তাদের করুণ কণ্ঠ শোনা গেল,—দুটো খেতে দাও মা। দুদিন খেতে পাইনি মা।—জীতেন বাবু মুখ তুলে তাকালেন। তারপর বন্ধ করে দিলেন জানলাটা।

এমন সময় তাঁর স্ত্রী মনোরমার প্রবেশ। পরনের শাড়ি জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া, কোথাও কোথাও হলুদের ছোপ।

মনোরমা :—হ্যাঁ গা, ঘরে যে চাল নেই এক মুঠো। খোকনদের খেতে দোবো কী?

জীতেন :—আমি আর কি করবো বলো? দেখ, পুরনো শিশি বোতল বেচে যদি—

মনোরমা :—ও সব বেচে সাফ করে দিয়েছি। তোমার কাছে এক সের চালের দামও হবে না?

জীতেন বাবু ঘাড় নাড়লেন। মনোরমা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। জীতেনবাবু তক্তপোশ থেকে উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন অস্থিরভাবে।

—কী রকম লাগছে আপনাদের?”

অমর চাটুজ্যে, মনোহরদাস এবং অন্যান্য যারা ছিলো সবাই হেসে ফেললো।

“এই সংলাপ শুনিয়ে তুমি নাটক জমাতে চাও ছবুলা? এ শুনতে পয়সা খরচা করে কেউ আসবে? এসব কথা তো লোকে আজকাল বাড়িতে বসেই বলছে।”

“ঘরোয়া জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে যে নাটক নয়, আজকের দিনে সে নাটকের কোন দাম নেই রঞ্জন,” ছবুলা উত্তর দিলো।

অমর চাটুজ্যে বললো, “আমরা নাটকের দাম যাচাই করি টিকিটের সেল দেখে। তাতেই বোঝা যায় এ নাটক লোকের ভাল লেগেছে কি লাগেনি। জুপিটার থিয়েটারে এই শায়েস্তা খাঁ তিন শো রাত্রি রান্ দিয়েছে।”

ছবুলা কোনো কথা বললো না।

উঠে পড়লো আস্তে আস্তে।

"একি, কোথায় চললে ছবুলা ?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

"চলে যাচ্ছেন কেন ?" বললো অমর চাটুজ্যে, "রাগ করলেন নাকি আমাদের উপর ?"

"না রাগ করিনি," ছবুলা ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলো, "শুধু আক্ষেপ হচ্ছে এই ভেবে যে আমি আগে কেন বুঝতে পারি নি। রঞ্জনের কথা শুনে মনে করেছিলাম আমাদের মতো আপনারাও বোধ হয় একটি শখের দল, নাট্য-আন্দোলনে একটি নতুন ধারা আনবার চেষ্টা করছেন। এখন দেখছি চ্যারিটি শো-র মধ্যেও টাকা-আনা-পাই-ই আপনাদের কাছে মুখ্য ব্যাপার। আপনাদের সঙ্গে আমার বনবে না।"

রঞ্জনও উঠে দাঁড়িয়েছিলো।

তাকে ছবুলা বললো, "তোমায় আর আসতে হবে না রঞ্জন। আমি একাই যেতে পারবো। তুমি বোসো। আমার অন্য কাজ আছে।"

চাটুজ্যে বললো, "আচ্ছা, মিস গাঙ্গুলী, আমাদের নাটক অনুমোদন আপনি না হয় নাই করলেন, আমাদের এখানে সঙ্গীত পরিচালনার ভারটা অন্তত নিন। তাতে আপনি নতুন যা খুশী করতে পারেন।"

"সে হয় না," উত্তর দিলো ছবুলা।

তারপর আর কিছু না-বলে বেরিয়ে চলে গেল।

ছবুলা বেরিয়ে যেতে মনোহরদাস বললো, "তোমরা কেলেঙ্কারি করলে। মেয়েটির গানের বক্স অফিস আছে। ওকে বেশ কাজে লাগানো যেতো, তা নয়, তোমাদের বাঙালীদের একটা তর্ক করা স্বভাব, নাটক নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলে। ওকে অন্যভাবে বোঝানো

যেতো, যেমন, এই 'শায়েস্তা খাঁ' নাটকটি টাকা দিয়ে নেওয়া হয়েছে, এখন এটা বাদ দেওয়া চলে না, এটা হয়ে যাক, তারপর আপনারটা হবে, এরকম একটা কিছু বলে এখনকার মতো ওকে দলে রাখা যেতো আর এ নাটকে সঙ্গীত পরিচালনা করিয়ে নেওয়া যেতো। তা তো নয়, তোমরা ওকে বোঝাতে গেলে যে ও যেই নাটকটা এনেছে ওটা কিছু নয় আর শায়েস্তা খাঁর মতো নাটক হয় না। আরে, এরা অন্য জমানার লোক, এদের যা মতামত সেটা তর্ক করে পাল্টানো যায় না, পয়সা দেখিয়েও হাত করা যায় না। তোমরা জানোই না এদের কী ভাবে সামলাতে হয়। আমার চারটে মিলে চারটে জঙ্গী ইউনিয়ান আছে। এর চেয়ে কড়া টাইপের লোক হামেশা সামলাচ্ছি। আর একটি মেয়েকে তোমরা ম্যানেজ করতে পারলে না।"

"যাকগে। ওকে বাদ দাও," বললো চাটুজ্যে, "কি বলো রঞ্জন —।"

রঞ্জন কোনো উত্তর দিলো না।

মনোহরদাস বললো, "না, না, ওকে বাদ দেবো না। ওকে আমাদের কাজে লাগবে। রঞ্জনবাবু, এক কাজ করো, তুমি আবার গিয়ে দেখা করো এঁর সঙ্গে। প্ল্যানটা বাতলে দিচ্ছি, শোনো মন দিয়ে··· ।"

বাড়ি ফিরে এসে ছবুলা দেখলো দীপক বসে আছে তার অপেক্ষায়।

"কি খবর দীপক, তুমি কতক্ষণ ?"

ছবুলা দীপককে চা করে এনে দিলো এক কাপ আর এক কাপ নিজে নিয়ে বসলো।

"তারপর তোমাদের কি খবর বলো।"

"আমাদের খবর ? আমরা আছি ভালোই, তবে সবারই মন খারাপ।"

"কেন ?"

"কারণ তুমি আমাদের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছো," বলে দীপক একটু হাসলো।

কিন্তু ছবুলা গম্ভীর হয়ে গেল।

বললো, "আমি তো ছাড়িনি। তোমরাই ছেড়েছো।"

"তুমি একটু ভুল বুঝেছো আমাদের। আমরা তো ছাড়িনি।
আমরা এড়াতে চেয়েছি শুধু রঞ্জনকে। সেই রাগে তুমি আমাদের ছাড়লে।"

"দেখ দীপক, রঞ্জনের উপর তোমাদের হঠাৎ এত আক্রোশ কেন জানিনা। আমি ওকে আমাদের মধ্যে আনতে চেয়েছিলাম কারণ ও অভিনয় করে ভালো আর গানও ভালো গায়। আমাদের অনুষ্ঠানে গেয়েওছে। হয়তো একটা কারণ থাকতে পারে, নাটক সম্বন্ধে তার ধারণা একটু সেকেলে। কিন্তু তার মতামতের উপর

তো আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করা হবে না। সময় মতো আমি ওকে ধীরে সুস্থে বদলে নিতে পারতাম। সেটুকু ভরসা তোমরা আমার উপর রাখলে না কেন?"

দীপক হাসলো।

বললো, "ছবুলা, এত কথা ভেবে তো তুমি তাকে আমাদের মধ্যে আনতে চাও নি।"

ছবুলা তাকালো দীপকের দিকে।

দীপক আস্তে আস্তে বললো, "তুমি তাকে ভালোবাসো। তাই তাকে এখানে ধরে রাখতে চেয়েছো।"

ছবুলা চুপ করে রইলো একটুখানি।

তারপর হেসে ফেলে বললো, "দেখ দীপক, কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে তাকে কি আর নিজের ক্লাবের মেম্বার করে রাখতে চায়?"

দীপক উত্তর দিলো, "আমাদের প্রতিষ্ঠানটি ক্লাব নয় ছবুলা, সেকথা তুমিও জানো, আমরাও জানি। একটি নতুন নাট্য-আন্দোলনের মধ্যে আমরা নেমে পড়েছি, একসঙ্গে কাজ করছি, গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসে একটা নতুন কিছু করবার স্বপ্ন দেখছি আমি, তুমি, আমরা প্রত্যেকেই। এর পিছনে আছে আমাদের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনের একটা নতুন আদর্শ। তুমি রঞ্জনকে নিজের জীবনে চেয়েছো, তাই তাকে নিজের কাজের ক্ষেত্রেও সহকর্মী হিসেবে চেয়েছো। আমরা জানি রঞ্জনের মতো ছেলের সঙ্গে আমাদের বনবে না, তাই তাকে আমরা চাই নি। এই অভিমানে তুমি সরে যেতে চাইছো, তাই না?"

ছবুলা চুপ করে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না।

দীপক বলে চললো, "এখন তুমি নিজের কাজের ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র

করে নিতে চাইলে রঞ্জনের সহযোগিতা নিয়ে। কিন্তু বোধ হয় দেখছো তাতেও অসুবিধে হচ্ছে।"

ছবুলা চোখ তুলে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করলো, "কি রকম?"

"হয়তো তুমি যে ভাবে কাজ করবে ভাবছো, তাতে রঞ্জনের সমর্থন বা সহযোগিতা পাচ্ছো না। তার নিজের একটা অন্যধরণের কর্মক্ষেত্র আছে, যেটা তার একরকম পেশা। সে তোমায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে সেখানে। কিন্তু তাতে তুমি অসোয়াস্তি বোধ করছো।"

ছবুলা হেসে বললো, "তুমি তো দেখছি আমায় খুব চিনে ফেলেছো!"

"তুমি ঠাট্টা করে বললে বটে ছবুলা, কিন্তু এদ্দিন ধরে তোমার সঙ্গে মিশে আসছি, আমরা সবাই ছেলেবেলার বন্ধু, তোমায় আমি খানিকটা চিনি।"

"অতো চেনবার চেষ্টা না করলেই ভালো হোতো।"

"চেষ্টা করে চিনতে হয় নি ছবুলা," দীপক আস্তে আস্তে বললো।

"কি করে চিনলে তাহলে?"

দীপক মুখটা ফিরিয়ে নিলো, জানলা দিয়ে তাকালো বাইরের দিকে, আকাশের এপার থেকে ওপার দেখে নিলো।

তারপর ফিরে তাকিয়ে বললো, "তোমার মনে পড়ে ছবুলা, অনেক ছেলেবেলায় যখন, তুমি, আমি, মীনু, আমরা সবাই স্কুলে পড়ি, দুর্গাপূজো, সরস্বতীপূজোয় পাড়ার থিয়েটার দেখে এসে প্ল্যান করতাম, বড়ো হয়ে আমরাও থিয়েটার করে বেড়াবো, শুধু এক-জায়গায় বসে থাকবো না, ঘুরে বেড়াবো গাঁয়ে গাঁয়ে, শহরে শহরে। তারপর যখন বড়ো হলাম, একটা আদর্শ খুঁজে পেলাম সেই স্বপ্নের মধ্যে। যা ছিলো স্বপ্ন, সেটা জীবনে সত্যি হয়ে উঠলো, যেটা মনে

হয়েছিলো ছেলেমানুষি, তার মধ্যে একটা পথের সন্ধান পেলাম। তুমি, আমি, মীনা, তারপর সুবোধ, বিমল—"

"হঠাৎ তোমার কী হোলো বলো তো?" ছবুলা তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে বললো, "বড্ড সেন্টিমেণ্ট্যাল হয়ে পড়ছো মনে হচ্ছে।"

থেমে গেল দীপক।

তারপর বললো, "তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি সেটা হোলো তুমি আবার এসো আমাদের মধ্যে। যদি চাও তো রঞ্জনকেও নিয়ে আসতে পারো।"

"রঞ্জন সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তি মিটে গেছে?"

"না।"

"তাহলে তাকে নিয়ে আসতে বলছো কেন?"

"আমাদের মধ্যে ও যদি এসে পড়ে, তাহলে ওর আর আমাদের মধ্যে অমিল কোথায় সেটা তুমি খুব ভালো করে বুঝতে পারবে।"

একটু চুপ করে রইলো ছবুলা।

তারপর বললো, "ও আসবে না।"

আবার চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললো, "ও আসতে চাইলেও আমি তাকে আনবো না।"

দীপক হাসলো।

আস্তে আস্তে বললো, "সে আমি জানি। ওর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু আমরা জানি যা তোমায় বললে তুমি বিশ্বাস করতে না কিছুতেই, এখনো হয় তো জানো না—"

"কী ব্যাপার বলো তো?"

"বলবো একদিন। আগে বলো আমরা আবার একসঙ্গে একটা নতুন বই নামাচ্ছি কিনা ?"

অনেকক্ষণ চুপচাপ দুজনেই।

তারপর ছবুলা চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, "রিহার্স্যাল কবে।"

"রোববার, আমাদের বাড়িতে।"

"বেশ, রোববার দেখা হবে।"

রাস্তার মোড়ে এদিকের ট্রাম স্টপে একটি ট্রাম এসে থামলো। তাতে উঠে পড়ে দীপক চলে গেল।

ওদিকের ট্রাম স্টপে আরেকটি ট্রাম এসে থামলো। ট্রাম থেকে নামলো রঞ্জন।

ছবুলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিলো বাইরে।

কথা বলছিলো রঞ্জন।

ছবুলা শুনছিলো।

রঞ্জন বলছিলো, "ছবুলা, চাকরি করে যা পাই তাতে আজকাল সংসার চালানো যায় না। যে চাকরি করছি, তাতে যে জীবনে কোনো উন্নতি করা যাবে তাও মনে হয় না। ভগবান আমায় গলা দিয়েছে, চেহারা দিয়েছে, অভিনয় করবার ক্ষমতা দিয়েছে—জীবনে যা কিছু করবার ওসব ভাঙিয়েই করতে হবে। শুধু শিল্পী হলেই চলবে না, সেই সঙ্গে ব্যবসায়ীও হতে হবে, তা নইলে অন্য লোকে আমাদের মাথায়ই কাঁঠাল ভেঙে খাবে।"

"তুমি কী বলতে চাইছো," ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"আমি শুধু এটুকু বলতে চাইছি যে লোকে অভাব অনটনে হাঁফিয়ে উঠেছে। লোকে চায় আমোদ-প্রমোদ, হৈ হল্লা, নাচ গান।

সুতরাং এ ব্যবসায় নেমে লোকের রুচি অনুযায়ী নাটক বা সঙ্গীত পরিবেশন না করলে পয়সা করা যায় না। শিল্পী হিসেবে আমারও আদর্শ আছে বৈকি, কিন্তু আদর্শ আঁকড়ে পড়ে থাকলে যদি ভাত-কাপড় না জোটে, তাহলে উপস্থিত আদর্শ নিয়ে অতো বাড়াবাড়ি না করে লোকের রুচির সঙ্গে আর যারা এ ব্যবসায় টাকা ঢালতে চায় তাদের রুচির সঙ্গে একটুখানি আপোস করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর, একবার যখন প্রতিষ্ঠা পাবো, কার তোয়াক্কা কে করে। তখন আমাদের আদর্শ অনুযায়ী দর্শককে যা দেবো, ওরা তাই নিতে বাধ্য হবে।"

ছবুলা হাসলো।

তারপর বললো, "তাহলে এটা তোমাদের ব্যবসা। হসপিট্যালের জন্যে চ্যারিটি নয়—।"

রঞ্জন একটু থতমত খেয়ে গেল।

কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। সামলে নিয়ে উত্তর দিলো, "এবার যেটা করছি এ চ্যারিটি। সত্যি কথা বলতে এটা আমাদের পাব্লিসিটি। এর পর যা করবো একেবারে পেশাদারী হয়েই করবো।"

"ও রকম পেশাদারী হবার জন্যে আমি গান শিখিনি, রঞ্জন।"

রঞ্জন একটুখানি তাকিয়ে রইলো ছবুলার দিকে।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "রেডিওতে প্রোগ্রাম হলে তুমি টাকা নাও না?"

"হ্যাঁ, নিই।"

"গ্রামোফোন কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নাও না?"

"নিই বইকি।"

"গানের স্কুলে মাষ্টারি করে টাকা নাও না?"

"তাও নিই।"

"এরপরও কি তুমি বলতে চাও তুমি পেশাদারী নও ?"

"তোমরা যে রকম পেশাদারী হওয়ার চেষ্টা করছো, সে রকম পেশাদারী আমি নই। রেডিওতে বা গ্রামোফোন কোম্পানিতে আমায় কেউ বলে না যে তোমায় এরকম গান গাইতে হবে না, হাল্কা চুটকি গান গাইতে হবে। আমি যা গাই, যে ভাবে গাই, তারই জন্যে কনট্রাক্ট পাই। গানের স্কুলে আমি যা শেখাই, যে ভাবে শেখাই, মেয়েরা তাই শেখে, সেভাবেই শেখে। কিন্তু তুমি কি চাইছো ? যে ধরনের নাটক আমি পছন্দ করি না, সে ধরনের নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা তুমি আমায় দিয়ে করিয়ে নিতে চাও। ওতে নিশ্চয়ই এমন ধরনের গান থাকবে যার ভাষা আমি পছন্দ করি না, তাতে এমন সুর দিতে হবে যে সুর ধোপার গাধাও দিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের সঙ্গীতে যদি বিদেশী জ্যাজ ঢোকাতে হয় তো আমাকে কেন, কলকাতা শহরে অনেক লোক পাবে।"

রঞ্জন একটু চুপ করে রইলো। একটি সিগারেট ধরালো, সেটি শেষ করলো, শেষ করে বাকিটুকু জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

তারপর বললো, "ছবুলা, তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার অনেক আগের থেকেই তোমার নাম শুনেছি। তোমার রেকর্ড শুনেছি, রেডিওতে তোমার গান শুনেছি, দু-একটি কনফারেন্সেও শুনেছি। একবার নিউ এম্পায়ারে তোমার অভিনয়ও দেখেছি, বইটা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের। যদ্দুর মনে পড়ে 'তপতী'। তোমায় গাইতে শুনেছি খেয়াল, ঠুংরি, ভজন, রবীন্দ্রসঙ্গীত। তোমার গায়কী খুব ভালো, তোমার ঘরওয়ানার মধ্যেও অভিনবত্ব আছে, কিন্তু নতুনত্বটা কী বলো তো ? রবীন্দ্রসঙ্গীতও যা শুনেছি, সে তোমার মিষ্টি গলায় শুনতে বেশ ভালো লাগে, কিন্তু গাওয়ার ঢংটির মধ্যে তোমার নিজস্ব

কিছু নেই। যারা ভালো গায়, ঠিক তেমনি ভাবেই গায়। হ্যাঁ, তোমার বাংলা রাগপ্রধান গানগুলো একটু নতুন ধরনের কিন্তু তার মধ্যেও যেটা অভিনবত্ব, সেটা তোমার ঘরওয়ানার। তাকে নতুনত্ব কিছু বলবো না। ভাষার নতুনত্ব যেটা তুমি দাবী করো, সেটা নতুনত্ব বলে আমি মানতে রাজী নই, গানের ভাষা একটু অস্বাভাবিক আর উদ্ভট হলেই তাকে মৌলিক বা নতুনত্বময় বলা যায় না। বিমলের লেখা এখনো খুব কাঁচা। আগে ভালো কবিতা লিখতে শিখুক, তার-পর গান লিখবে।"

"সে কথা অন্যান্য গীতিকারদের গিয়ে বলো রঞ্জন, তারপর আমায় উপদেশ দিতে এসো। একজন আমায় আগে ভাষা দেবে, তারপর আমি সুর দেবো, সে ভাবে ভালো গান তৈরী হয় না রঞ্জন। সুর হোলো মনের ভাবের একটি প্রকাশ। আগে মনের সেই বিশেষ ভাবটি রূপ গ্রহণ করুক। তারপর তার জন্যে ভাষা তৈরী হবে। আমি বিমলকে সামনে বসিয়ে সুর শোনাই, তারপর সে ভাষা বুনে দেয়। আর তখন সে ভাষা কোনো চিরাচরিত ব্যাকরণ মেনে চলে না, 'ভালোবাসি'র সঙ্গে চরণ মেলাবার জন্যে 'পাশাপাশি' ছাড়াও অন্য নতুন শব্দ ভাবতে পারে।"

রঞ্জন একটু মাথা নাড়লো। কথার মোড় ফেরালো সে। জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ছবুলা, তোমার সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাপ সে দিন থেকেই শুনছি, তুমি আর তোমার বন্ধুরা নতুন কিছু করবার চেষ্টা করছো। আমি তো নতুন কিছু দেখলাম না। এই নতুন কিছুটা কি বলতে পারো?"

"হ্যাঁ, পারি," ছবুলা উত্তর দিলো। "তোমাদের হাল্কাগান, তোমাদের নাটক, সে দর্শককে কিছুক্ষণের জন্যে উত্তেজিত করে

রাখতে পারে। তোমরা যা দাও, তাতে শুধু নেশার ঘোর আসে গেলাসের মদের মতো, সে সবাইকে তার চারপাশের সব কিছু ভুলিয়ে দেয় কিছুক্ষণের মতো।"

"যাই বলো, লোকে তাই চায়—।"

"লোকে সত্যি সত্যি তাই চায় না, লোকে নিরুপায় হয়ে গ্রহণ করে। লোকে পালাতে চায় তাদের পরিবেশ থেকে, তাই সহ্য করে তোমাদের, হাততালি দেয়, পয়সা দেয়।"

"আনন্দ পায় বলেই দেয়।"

"না ভাই, আনন্দটা ঠিক পায়না। শিল্পীর গাওয়াটুকুই গান নয়, অভিনেতার অভিনয় এবং নাটকের নাটকীয়তাই নাটক নয়। গান বা অভিনয়ে যতক্ষণ শ্রোতা বা দর্শকের মনও এক হয়ে মিলে যেতে না পারলো, ততক্ষণ তার কোনো সার্থকতা নেই। আর এই এক হয়ে যাওয়াটা কখনোই সম্ভব নয়, যতক্ষণ এই গান বা নাটক তার জীবনের কোনো না কোনো একটা দিকের সত্যিকারের প্রকাশ নয়।"

রঞ্জন হাসলো।

ছবুলা বললো, "তুমি হাসছো, রঞ্জন, যা সত্যিকারের নাটক বা সত্যিকারের গান, তা মানুষকে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনে না, তার পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।"

রঞ্জন উত্তর দিলো, "দেখ, ওসব বড়ো বড়ো কথা। আমি বুঝিনে ওসব। আমি শুধু এটুকু বুঝি, যে কোনটা লোকে চায় আর কোনটা চায় না, তার বিচার হবে হলের দরজায় লোকের ভিড় দেখে।"

"তোমায় আর বোঝানো যাবে না রঞ্জন," ছবুলা হতাশ হয়ে বললো, "কারণ তুমি বুঝতে চাও না।"

"তুমি শুধু বক্তৃতাই দিলে, নতুন তুমি কি করছো, তাতো বললে না।

"তাই তো বলবার চেষ্টা করলাম এতক্ষণ।"

"আমি শুধু এটুকুই বুঝলাম যে প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের নাটকের চাইতে অজানা লোকের কাঁচা হাতে লেখা নাটকের পিছনে মেহনত করাই নতুনত্ব, যে গান লোকে উপভোগ করে, যে গানের ভাষা লোকে বুঝতে পারে, ওসব গান তাদের না শুনিয়ে, যে গানের ভাষা লোকে বোঝে না, যে গানের সুর লোকের এক ঘেয়ে লাগে, সে গান নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়াই নতুনত্ব।"

ছবুলা হেসে জিজ্ঞেস করলো, "আমার গানগুলো কি তোমার খুব একঘেয়ে লাগে রঞ্জন।"

"না, না, সে কথা বলছি না—।"

"শোনো রঞ্জন। যে নাটক আমাদের দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না নিয়ে লেখা তাই সত্যিকারের নাটক, যার অভিনয়ে আমাদের নিজেদের চলা বলা আর উপলব্ধিকে খুঁজে পাই, তাই সত্যিকারের অভিনয়। যে গানের ভাষায় আমাদের আজকের দিনের অনুভূতির প্রকাশ, যে গানের সুর আমাদের লোক-সঙ্গীতের এবং রাগ-সঙ্গীতের ঐশ্বর্যের প্রকাশ, তাই সত্যিকারের গান।"

"মানলাম। কিন্তু তোমার কথায় শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি বলতে চাইছো অন্য সবাই যা করছে, তা সত্যিকারের নয়, তুমি যা করতে চাইছো, তাই সত্যিকারের। সে তর্কের মধ্যে না গিয়ে শুধু জানতে চাইছি, নতুন যা করতে চাইছো, সেটা তাহলে কি?"

"এখনো যা কিছু পুরনো—আঙ্গিক বা ভাবসম্পদ, ফর্ম বা

কন্‌টেণ্ট—সে সব যখন নতুন ছিলো অতীতের কোনো এক সময়ে, তখন সে ছিলো সত্যিকারের। এখন সে পুরনো হয়ে অচল হয়ে গেছে, এখনকার জীবনের কোনো কিছু প্রকাশের বাহনই সে নয়, সুতরাং সে ভাবে এখন যা হচ্ছে সবই মিথ্যে। সুতরাং চাই নতুন আঙ্গিক, নতুন ভাব সম্পদ। নতুন যা আমরা করতে চাইছি, সেটা এই।”

রঞ্জন রুমাল বার করে কপালের ঘাম পুঁছে নিলো।

তারপর বললো, “আমি অতো সব বুঝিনে। আমার টাকা চাই। লোকে যা দেখলে টাকা দিতে চাইবে, তাই করবো। যা দেখলে টাকা দিতে চাইবে না, তা করবো না।”

“তুমি কি করে জানো যে নতুন কিছুর জন্যে লোকে টাকা দিতে চায় না?”

“বোর্ডে যা চলছে—”

“তাতে লোকে কিসে টাকা দিচ্ছে তাই দেখছো। নতুন কিছু পেলে যে আরো দিতে চাইবে না, তা কি করে বুঝলে?”

“তাই যদি হবে তো বোর্ডে নতুন ধরনের কিছু দেখা যায় না কেন?”

“তোমার মতো লোক, চ্যাটার্জির মতো লোক, মনোহরদাসের মতো লোক এদ্দিন বোর্ড চালিয়ে আসছে বলে। আমাদের মতো নতুন নতুন দল সব তৈরী হোক, তখন দেখো। এ্যামেচার ক্লাবগুলো যখন নতুন নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করে তখন কি রকম ভিড় হয় জানো? একথা জেনে রাখো যে দেশের লোকের নাটকের রুচি তৈরী করে পেশাদার থিয়েটার নয়, তৈরী করে এ্যামেচারদের থিয়েটার। আমাদের দেশে নাটক গড়ে তোলে পেশাদারেরা নয়, গড়ে তোলে কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল, এঁদের মতো এ্যামেচারেরা।

গিরীশ ঘোষও প্রথম দিকে এ্যামেচারই ছিলেন। তারপর তাঁদের পথ ধরে এলো পেশাদারী থিয়েটার। ইদানিং আমাদের এ্যামেচারেরা পেশাদার থিয়েটারকেই হুবহু নকল করছিলো, পূজোয় পার্বনে বা যে কোনো উপলক্ষে ওরা 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'বঙ্গেবর্গী', 'মিশরকুমারী' ছাড়া আর কোনো নাটক করবার কথা ভাবতেই পারতো না। কিন্তু হাওয়া বদলাচ্ছে এখন। ওদের নাটক ওরা নিজেরা লিখছে, নিজেরা তৈরী করছে। যতো বেশী এ্যামেচার দল এ পথে এগুবে, ততো তাড়াতাড়ি লোকের রুচি বদলাবে। তখন দেখবে পেশাদার রঙ্গমঞ্চও চলে এসেছে এই নতুন রাস্তায়। এ্যামেচারদের এই নতুন পথে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করবার জন্যেই আমাদের নাট্য-আন্দোলন। আরেকবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম রঞ্জন, নতুন যা কিছু আমরা করবার চেষ্টা করছি, সেটা এই।"

রঞ্জন মাথা নাড়লো। বললো, "আমি অতো সব জানিনে, আমার টাকা চাই।"

"ও ভাবে আমার টাকা চাইনে রঞ্জন," ছবুলা উত্তর দিলো।

"টাকা না হলে তোমার চলে?"

"আমার বেঁচে থাকবার জন্যে টাকার দরকার। শুধু টাকা করবার জন্যেই কিন্তু আমার বেঁচে থাকা নয়।"

"এর কোনো আপোস হয় না ছবুলা," রঞ্জন উত্তর দিলো।

"আমি তো আপোস করতে চাইছিনা। রাত হচ্ছে রঞ্জন, এবার তুমি বাড়ি যাও।"

কিন্তু রঞ্জনের উঠবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

সে বললো, "আচ্ছা, এমন কেন হয় না যে তোমার কাজ নিয়ে তুমি থাকবে, আমার কাজ নিয়ে আমি থাকবো, যে যার নিজের

মতন। কিন্তু কাজের বাইরে যে জীবনটা সেটা তোমার আর আমার একলার, তার সঙ্গে আমাদের বাইরের জীবনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সেখানে আমাদের মতের অমিল থাকবে না কোনো কিছুতে, তাই মনান্তরেরও কোনো কারণ থাকবে না। ঘরোয়া জীবনটা আমাদের দুজনার, বাইরের জীবনটা যার যার নিজের।"

"সে হয়না রঞ্জন," ছবুলা আস্তে আস্তে বললো।

"কেন হয় না," রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

"যে ঘরোয়া জীবন আমার বাইরের জীবনকে সার্থক করে তুলবার প্রেরণা দিতে পারবে না, তার কোনো দাম নেই আমার কাছে।"

"তার মানে কি তোমার জীবন থেকে আমায় একেবারে বাতিল করে দেওয়া?"

ছবুলা উত্তর দিলো, "রঞ্জন, ভেবেছিলাম তুমিও শিল্পী, আমিও শিল্পী, আমাদের এটুকু মিলই যথেষ্ট। কিন্তু এখন দেখছি আমাদের পরিবেশের যেটা অমিল সেটাকে কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। যদি জীবনের পথ আমাদের এক সঙ্গে চলতে হয়, তাহলে তোমার পরিবেশের সীমাবদ্ধতা আর দৃষ্টিকোণের সঙ্কীর্ণতা আমায় মেনে নিতে হবে, নয়তো বা আমার কাজের মধ্যে তোমাকেও টেনে আনতে হবে। প্রথমটা অসম্ভব। তার পরেরটা দুঃসাধ্য। সুতরাং, পরিবেশের অমিল না কাটিয়ে কোনো রকমের মনের মিল হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

"মনের মিল যদি না থাকে তো আমাদের এই ভালোবাসা জন্মালো কোত্থেকে?" রঞ্জন খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো।

"আমিও তো সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি," ছবুলা বাইরের দিকে

তাকিয়ে উত্তর দিলো। "তোমার তো কিছু আসে যায় না রঞ্জন, কাল আমাকে ভুলে গিয়ে আরেকটি মেয়েকে ভালোবাসবে, কিন্তু আমি তো বাঙালী গেরস্তঘরের মেয়ে, আমার পক্ষে তো সেটা সম্ভব নয়।"

"এর পর যদি কোনো দিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয় তাহলেও কি তুমি আমায় মনে রাখবে ছবুলা?"

ছবুলা একটু হাসলো।

বললো, "মেয়েরা এত প্রশ্নের উত্তর দেয় না রঞ্জন। তুমি যদি আমায় বুঝে থাকো তো তোমার মুখ ফুটে কিছু বলা নিস্প্রয়োজন, যদি আজো না বুঝে থাকো তো বলা আরো বেশী নিস্প্রয়োজন।"

রঞ্জন চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। কি যেন ভাবলো।

বাইরে ঘণ্টী ঠুন ঠুন করে একটি রিক্‌শা চলে গেল।

তখন রঞ্জন খুব সহজ গলায় বললো, "এখন যে কাজের জন্যে এসেছি শোনো। শুধু আমার নিজের ব্যাপার হলে আসতুম না। তুমি চলে এসেছো বলে চাটুজ্যে আর মনোহরদাস খুব দুঃখিত হয়েছেন। ওঁরা চান যে তুমি আমাদের মধ্যে থাকো।"

ছবুলা একটু অবাক হয়ে তাকালো রঞ্জনের দিকে।

তারপর মাথা নাড়লো।

"সে হয় না রঞ্জন।"

"শোনো। তুমি যখন বিরূপাক্ষ চক্রবর্তীর বইটি পছন্দ করো নি, তখন ওটা আমরা করবোনা। তবে আমরা যখন বিমল সাহার বইটি ভরসা করে করতে পারছি না, তখন ওটাও আপাতত বাদ দাও। কিন্তু হসপিট্যাল ফাণ্ডের টাকাটা তো তুলে দিতে হবে, সে কাজের ভার যখন নিয়েছি। তাই আমরা স্থির করেছি যে একটি মিউজিক্যাল শো গোছের করবো। এটা সংগঠন করবার

ভার তুমি নাও। তুমি যে ভাবে খুশী প্রোগ্রাম করো, আমরা কেউ কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবো না। আমরা শুধু টিকিট বিক্রির ভার নেবো। প্রোগ্রামের ব্যাপারে তুমি যা বলবে তাই হবে।"

ছবুলা তাকিয়ে রইলো রঞ্জনের দিকে।

একটু থেমে রঞ্জন বললো, "আমার একটা কথা শুনবে ছবু? ওদের আমি কথা দিয়েছি যে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। এবারের মতো তুমি আমার কথা রাখো, এই শো-টার ভার নাও। এটা হয়ে যাক, তারপর ওদের সংস্রব তোমায় রাখতে হবে না। আমি সরে আসবো।"

ছবুলার মুখে তখনো কোনো উত্তর নেই। সে রঞ্জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

রঞ্জনের হৃদয়-স্পন্দন দ্রুততর হোলো।

ছবুলা একটু নড়ে বসলো।

আস্তে আস্তে বললো, "একটি শর্তে যেতে পারি—।"

"বলো—।"

"আজ দীপক এসেছিলো।"

রঞ্জন একটু শঙ্কিত হোলো।

"কেন?"

"আমায় ওরা ডেকেছে। আর—আর বলেছে, তোমাকেও নিয়ে যেতে। যদি তুমি ওদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী থাকো তাহলে আমিও তোমার কথায় রাজী।"

রঞ্জন তাকিয়ে দেখলো ছবুলাকে। বড়ো গভীর তার চোখ, গম্ভীর তার দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে একটুখানি ম্লান হাসির আভাস।

রঞ্জন একটু দমে গেল। কিন্তু সামলে নিলো এক মুহূর্তেই।

বললো, "বেশ, তাই হবে।"

ছবুলা তাকিয়ে দেখলো রঞ্জনকে।

দেখলো তার চোখ অতো গভীর নয়, চোখের দৃষ্টি বড়ো চঞ্চল, ঠোঁটের কোণে নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির আভাস।

দুজনেই চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর রঞ্জন বললো, "কাল এসে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। হাতে আর সময় বেশী নেই।"

রঞ্জন উঠে পড়লো।

সে দরজার বাইরে এক পা বাড়াতেই ছবুলা ডাকলো তাকে।

সে ফিরে দাঁড়ালো।

ছবুলা বললো, "একটা কথা মনে রেখো রঞ্জন, তোমাকে শেষ চান্স দিচ্ছি।"

রোববার দিন বিকেল বেলা ছবুলা যখন এলো মীনাদের বাড়ি তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

ছবুলা দেখলো আর কেউ নেই, শুধু দীপক, মীনা, বিমল আর সুবোধ।

রিহার্স্যালের কোনো আয়োজন নেই।

"রিহার্স্যাল কি আজ হচ্ছে না?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"না, আপাতত বন্ধ রেখেছি," দীপক বললো।

"কেন?"

দীপক কোনো উত্তর দিলো না। স্টেট্‌স্‌ম্যানটা খুলে সিনেমার বিজ্ঞাপনের পাতাটা এগিয়ে দিলো ছবুলার দিকে।

তলার দিকে একটি বড়ো বিজ্ঞাপন। কোন এক বেসরকারী হাসপাতালের জন্যে চ্যারিটি শো। ভ্যারাইটি প্রোগ্রাম। নিবেদন

করছে শিল্পী-ত্রিকোণ। প্রযোজনা করছে রঞ্জন গুহ। পরিচালনা করছে ছবুলা গাঙ্গুলী।

স্টেট্‌সম্যান রাখা হয় না ছবুলাদের বাড়ি। তাই এ বিজ্ঞাপন সে দেখেনি।

দীপক বললো, "এই ব্যাপারটা যদ্দিন মিটে না যায় তদ্দিন আমাদেরটা বন্ধ রেখেছি। তুমি তো একসঙ্গে দুটো পেরে উঠবে না।"

ঘরের ভিতর আর কারো মুখে কোনো কথা নেই।

সবাই চুপ করে বসে।

শুধু সুবোধ তার সরোদটা নিয়ে টুং টাং করছে।

দীপক টেবিলের উপর থেকে তার গীটারটি তুলে নিলো।

চেয়ার ছেড়ে ছবুলা উঠে দাঁড়ালো।

মীনা বললো, "একি, এরই মধ্যে উঠলে চলবে কেন ছবু?"

সে ছবুলাকে ছাড়লো না কিছুতেই। চা না খাইয়ে সে কিছুতেই উঠতে দেবে না। তার অনুরোধে যোগ দিলো সবাই।

এই অনুরোধের মধ্যে আন্তরিকতা ছিলো। সেটা ছবুলা অনুভব করলো।

তার সঙ্গ সবাই চায়। তাকে ভালবাসে সবাই। এরা তার অনেকদিনের বন্ধু। বিশেষ করে দীপক আর মীনা।

ছবুলার উপর ওদের ভয়ানক অভিমান। সেটা তাদের সৌজন্যতায়, নম্রতায়, অতি অমায়িক কথাবার্তায় আরো স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেলো—যদিও শিল্পী-ত্রিকোণের অনুষ্ঠান আর রঞ্জন গুহ সম্বন্ধে কোনো কথাই তুললো না কেউ।

ছবুলা বসলো তার চেয়ার টেনে।

ঘরের মাঝখানে বসে মীনা তার তানপুরোটি তুলে নিলো।

বললো, "আজ ভাই আমার একটি গান শোনো। এ গানে সুর দিয়েছি আমি নিজে। গানটা কার লেখা জানো? বিমলের। এ গান বিমল আমারই জন্যে লিখে দিয়েছে।"

হঠাৎ কি জানি কেন ঝাপসা হয়ে গেল ছবুলার চোখ।

মুখটি ফিরিয়ে নিলো।

সমস্ত পৃথিবী আস্তে আস্তে দূরে, অনেক দূরে সরে গেল ছবুলার শ্রুতি থেকে।

শুধু ভেসে এলো দূরাগত গীটারের মীড় আর সরোদে সুরের গমক।

সুরটি বড়ো মিঠে।

পশ্চিম আকাশের তখনো ফিকে সোনালী আর পূবের আকাশের বেগুনী অন্ধকারে দু একটি তারা ফুটে ওঠা রবিবারের সন্ধ্যায় বড়ো মিঠে লাগলো পিলু সুরটি।

অনেকক্ষণ পর বহু দূরান্ত স্মৃতির সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে মনটা আবার যখন ফিরে এলো সেদিনের পৃথিবীতে, মীনার গানটি তখন শেষ হয়ে আসছে।

গান শেষ হোলো।

শেষ কাঁপনটি দিয়ে দীপকের গীটার ক্ষীণ হয়ে এলো।

সরোদের সুরের রেশ তখনো ঘর ভরে আছে।

"কি রকম লাগলো ছবুলা?"

ছবুলা বিমলের দিকে তাকালো।

মনে হোলে যেন বিমল অনেক দূরে সরে গেছে। মনে একটা ধাক্কা খেয়ে প্রথম অনুভব করলো, যে একদিন অনেক কাছে ছিল— যেকথা তার মনে ধরা পড়েনি কোনোদিন।

চোখ ফিরিয়ে তাকালো দীপকের দিকে।

দেখলো যে সে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে চোখে গভীর স্নিগ্ধ সহানুভূতি।

যখন উত্তর দিতে গেল সে, তখন খেয়াল হোলো যে মীনার প্রশ্নের পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। তার উত্তরের অপেক্ষা করেনি কেউ।

সুবোধ টুং টাং করে সরোদ বাজাচ্ছে একটু একটু।

দীপক আঙুল বুলোচ্ছে গীটারের উপর।

মীনা চা তৈরী করছে।

আর বিমল জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের আকাশে চোখ ভাসিয়ে।

শিল্পী-ত্রিকোণের সঙ্গীত অনুষ্ঠান খুব সাফল্যময় হোলো। টিকিট বিক্রি হোলো বহু টাকার।

চাটুজ্যে, মনোহরদাস সবাই ছবুলাকে বললো, "আপনার জন্যেই এত সাকসেস্‌ফুল শো হোলো। এত ভালো শো আমরা এর আগে কোনোদিন করতে পারি নি।"

অনুষ্ঠানের দিন ছয় সাত পর শিল্পীদের একটি চায়ের পার্টি দিলো অমর চাটুজ্যে।

"আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন। গাড়ি পাঠিয়ে দেবো," অমর চাটুজ্যে ছবুলাকে বলেছিলো আগের দিন।

ছবুলা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই রঞ্জন বললো, "কিন্তু ও তো আসতে পারবে না।"

"কেন?"

"ওর মায়ের খুব অসুখ।"

"তাই নাকি? কি হয়েছে আপনার মায়ের?"

ছবুলা তাকালো রঞ্জনের দিকে।

ভাবলো, হয়তো কোনো কারণ আছে যে জন্যে রঞ্জন চায় না যে ছবুলা পার্টিতে আসুক।

বললো, "হার্টের অসুখে ভুগছেন অনেক দিন। সম্প্রতি অসুখটা বেড়েছে।"

ফেরার পথে ছবুলা জিজ্ঞেস করতে রঞ্জন বললো, অন্য কোনো

কারণ নেই, কাল সন্ধ্যেবেলা তোমার সঙ্গে বসে নিরিবিলি একটু গল্প করবো বলেই ওদের ওকথা বললাম। অন্য কোনো কারণ বললে তো ওরা শুনতো না। ওদের ওসব হৈ হুল্লোড় আমার ভালো লাগে না, তোমারও ভালো লাগবে না। আমিই আসবো তোমার বাড়িতে, ঠিক সন্ধ্যে নাগাদ।"

তারপর দিন।

সন্ধ্যে উতরে গেল।

সাতটা বাজলো, সাড়ে সাতটা বাজলো, আটটা, সাড়ে আটটা…।

রঞ্জনের দেখা নেই।

ছবুলা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

সে ভেবে রেখেছিলো যে রঞ্জন এলে এখানে বসে এলোমেলো কথা বলে সময় নষ্ট না করে রঞ্জনকে নিয়ে যাবে মীনাদের বাড়ি।

কিন্তু রঞ্জনটা আসবে বলে এলো না কেন, ছবুলা ভাবলো।

আটটা চল্লিশ।…পৌনে নটা…।

দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

এমন বকুনি দেবো রঞ্জনকে, ছবুলা ঠিক করলো। এত রাত করে কেউ আসে?

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

রঞ্জন নয়।

একজন বর্ষীয়সী মহিলা। ছবুলার চেনা। সতীশ মুখার্জী রোডের দিকে থাকেন। ওঁর মেয়ে শিল্পী-ত্রিকোণের অনুষ্ঠানে একটি নাচে অংশ গ্রহণ করেছিলো।

"আমি বসবো না ছবুলা," তিনি বললেন, "তোমায় একবার

আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসতে হবে। বড্ড দরকার। তোমায় নিঁয়ে যেতেই এসেছি।"

"কেন, কি হয়েছে," ছবুলা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

একটু চুপ করে থেকে মহিলাটি বললেন, "সরমা একটু অসুস্থ। ও একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।"

ছবুলা বেরিয়ে পড়লো ওঁর সঙ্গে।

পর্দা সরিয়ে ছবুলা সরমার ঘরে ঢুকলো।

ঘর অন্ধকার। সরমার মা আলো জ্বেলে দিলেন।

খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে আছে মেয়েটি।

পরনে একটি সিল্কের শাড়ি। বাইরে কোথাও গিয়েছিলো। ফিরে এসে তখনো কাপড় ছাড়ে নি। অমনি শুয়ে পড়েছে।

"কি হয়েছে সরমা," ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

সরমা কোনো উত্তর দিলো না।

ছবুলা ফিরে তাকালো সরমার মায়ের দিকে।

অত্যন্ত ম্লান ওঁর মুখ।

আস্তে আস্তে বললেন, "অমর চাটুজ্যেদের দলে মিসেস সমাদ্দার বলে কে একজন আছেন না? উনি এসে একদিন বললেন, আমার মেয়েকে ওঁর চাই। শিল্পী-ত্রিকোণের শো-তে ওকে নাচতে হবে।"

ছবুলার মনে পড়লো, মিসেস সমাদ্দার রঞ্জনদের দলের সেই মহিলাটি, যিনি শো-এর জন্যে মেয়ে সংগ্রহ করতেন।

সরমার মা বলে চললেন, "তুমি এদের মধ্যে আছো শুনে আমি যেতে অনুমতি দিলাম সরমাকে। নিয়মিত রিহার্স্যালে যেতো, রাত

ন-টা সাড়ে ন-টায় ফিরতো রিহার্স্যাল থেকে। আমার এদ্দিন ধারণা ছিলো রিহার্স্যাল হয় তো অতক্ষণ ধরেই হয়। আজ শুনলাম যে তুমি সাতটা সাড়ে সাতটায় রিহার্স্যাল শেষ করে বাড়ি চলে আসতে।"

ছবুলার মনের কোণে মেঘ জমতে শুরু করলো।

অস্ফুট গলায় বললো, "একি বলছেন আপনি ?"

"আজ ওদের চায়ের পার্টি ছিলো", আস্তে আস্তে বললেন সরমার মা, "দেখি ফিরে এসে বলছে ওরা সব জানোয়ার। এদ্দিন একটু রাত করে এলেও এমনি বসে গল্পগুজব করতো। আজ নাকি ওরা একটু অশোভন ব্যবহার করছিলো, তাই ও তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছে।"

ছবুলা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

"আমরা গরীব গেরস্ত। ওরা ধনী, ওদের তো কিছু বলা যায় না। দোষ আমারই। মেয়েকে ওর মধ্যে যেতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। তোমায় শুধু ডেকে আনলাম একটা কথা জিজ্ঞেস করতে। তোমায় তো খুব ভালো মেয়ে বলেই জানি। তুমি এদের মধ্যে জুটলে কি করে ?"

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ছবুলা।

তারপর সোজা উঠে পড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছবুলা যখন অমর চাটুজ্যের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো তখন নটা বেজে কুড়ি।

বাড়ির প্রত্যেকটি জানলায় আলো জ্বলছে যদিও, সাড়াশব্দ নেই একটুও।

অঞ্চলটা নিস্তব্ধ, বাড়িটা আরো নিস্তব্ধ।

রাস্তায় লোকজন নেই। পথের পাশে ল্যাম্প পোস্টের নিচে দু একটি বেড়াল চুপচাপ বসে।

বহুদূরে ঠুং ঠুং করে একটি রিক্‌শা চলে গেল।

ছবুলা একবার ভাবলো, আমায় আবার কি করবে অমর চাটুজ্যে। আমায় স্পর্শ করবার সাহসও ওর হবে না।

মনে মনে আশা করছিলো, এখানে রঞ্জনও আছে হয় তো। দরজার বেল টিপলো ছবুলা।

অমরবাবুর নেপালী চাকরটি এসে দরজা খুলে দিলো। ছবুলাকে সে চেনে। সেলাম করে বললো, "সায়েব উপরে আছেন। আপনি উপরে চলে যান।"

"আর কে কে আছেন?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"সবাই আছেন। রঞ্জনবাবু, মনোহরদাসজী, চ্যাটার্জি সায়েব আর দত্ত সায়েব। শুধু মিসিবাবারা চলে গেছেন।"

দত্তসাহেবটিকে ছবুলা চিনতো। যে হাসপাতালের জন্যে শোটি করা হয়েছে দত্তসাহেব তার সেক্রেটারি।

ছবুলা সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেল।

দোতলায় সিঁড়ির পাশে একটি ঘর থেকে গলার আওয়াজ শোনা গেল। দরজা একটুখানি ভেজানো।

ছবুলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

"আপনি বলতে চান মোটে তিনশো টাকা লাভ হয়েছে?" দত্তর কণ্ঠস্বর শ্রুত হোলো।

"হিসেব তো আপনাকে দেখিয়েছি," শোনা গেল মনোহরদাসের গলা। "আপনার যদি কোনো সন্দেহ থাকে তো যে কোনো চাটার্ড একাউন্টেন্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে পারেন।"

"না, না, সেকথা বলছিনা। কিন্তু সাত হাজার টাকার টিকিট

বিক্রি হোলো আর শো করতে ছ হাজার সাতশো টাকা খরচা হোলো ? এ কি করে সম্ভব ?"

"কেন হবে না দত্তসাহেব। আর্টিস্টদের কম টাকা দিতে হয়েছে ? আমাদের ছবুলা গাঙ্গুলী, তিনিই তো নিয়েছেন পাঁচশো টাকা।"

ছবুলার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিদ্যুত খেলে গেল।

"কিন্তু মোটে তিনশো টাকা লাভ ? এ হয় না। সব খরচার তো রসিদ নেই। এ আমাদের কমিটি বিশ্বাস করবে না।"

চুপচাপ কিছুক্ষণ। তারপর—

"দেখুন মিস্টার দত্ত, সংসারে সব কিছুই একটা মিউচুয়্যাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং এর ব্যাপার। ভুল বোঝাবুঝি হলেই গোলমাল. সন্দেহ, অবিশ্বাস। ঠিকমতো বোঝাবুঝি হলে সবই সরল, সহজ। বেশ আপনি যখন বলছেন যে আপনাদের কমিটি বিশ্বাস করবে না, মানছি যে করবে না। কিন্তু আপনি সেক্রেটারি, আপনিই সব। আপনি যদি হিসেবটা মেনে নেন তাহলে কমিটি যে আপত্তি করবে না সে আমরা জানি। আপনিই বলুন, আপনার ভাগে কতো এলে কমিটিকে এই হিসেব বিশ্বাস করানো সহজ হবে।"

"ও--। তা—, তাহলে—, তাই যদি বলেন, অবশ্যি ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই কোনো রকমে—"

"ভেতরে আসতে পারি ?" পর্দাটা তুলে ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"কে ? ও, আপনি ? আসুন, আসুন। এতক্ষণে এলেন ? আমি তো শুনেছিলাম আপনি আসবেন না। যাক, এসেছেন বলে খুব খুশী হলাম—।"

মনোহরদাসের আপ্যায়নের আনন্দ ছবুলার মুখে প্রতিফলিত হোলো না।

গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো, "অমরবাবু কোথায় ?"

"অমরবাবু? দাঁড়ান দেখছি," বলে দরজার কাছে এসে মনোহর-দাস হাঁক ছাড়লো, "চ্যাটার্জি! চ্যাটার্জি!!"

ওপাশের একটি ঘর থেকে অমর চ্যাটার্জি বেরিয়ে এলো।

"কী ব্যাপার? ও আপনি? হোয়াট এ্যান আন্‌এক্সপেকটেড প্লেশার। আসুন, এ ঘরে আসুন।"

অমর চ্যাটার্জির পদক্ষেপ একটু এলোমেলো।

"ও ঘরে যেতে পারবো না," ছবুলা উত্তর দিলো, "আপনি এখানে আসুন। কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"আপনি ও ঘরে গেলেই ভালো হয়," বললো মনোহরদাস, "এখানে আমরা একটু বিজনেস টক করছি।"

অমর চ্যাটার্জি এগিয়ে এলো ছবুলার কাছে।

বললো, "আসুন, শোনা যাক কি কথা আছে আপনার।"

"না। আমার যা বলবার এখানে দাঁড়িয়েই বলবো," ছবুলা উত্তর দিলো, "ওকি, জোর করে নিয়ে যাবেন নাকি, হাত ছাড়ুন।"

ছবুলার হাতটা ধরেছিলো অমর চ্যাটার্জি।

"হাত ছাড়ুন বলছি।"

সে হাত ছাড়লো না।

ছবুলা অন্য হাতে পায়ের স্লিপারটি খুলে নিলো।

সেটা অমর চ্যাটার্জির চোখ এড়ালো না। বললো, "আচ্ছা, ছ্যাট্'স্ ভেরি ইন্টারেস্টিং। বলেছিলেন আসবেন না, এলেন যখন, তখন বেশ রাত। ভাবলাম নিশ্চয়ই বেশ একটু রোমান্টিক মূড নিয়ে এসেছেন। যাক, ওসব লোক দেখানো ভালোমানুষির প্রয়োজন নেই। মনোহরদাস, দত্ত, এরা আমার বন্ধু, আপনি আমার সঙ্গে এলে ওরা কিছু মনে করবে না। ওরা জানে যে আমরা দুজনে দুজনকে বেশ—উঃ—।"

স্লিপারের স্পষ্ট একটি ছাপ পড়লো অমর চাটুজ্যের মুখে।

সে ভীষণ জেদী লোক। খুব চটে গেল।

বললো, "আচ্ছা, এত তেজ আপনার। ভালো, এরকম তেজ আমি বেশ পছন্দ করি—।"

"ছাড়ুন বলছি—।"

শুনলো না সে। ছবুলাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেললো। তুলে বেরিয়ে এলো ঘরের বাইরের প্যাসেজে।

মনোহরদাস একটু হেসে তার ঘরের দরজাটি ভেজিয়ে দিলো।

বাইরে চ্যাটার্জির হাতের মধ্যে নিরুপায় পাখির মতো ঝটপট করতে লাগলো ছবুলা।

বললো, "ছাড়ুন বলছি, নইলে খুনোখুনি হয়ে যাবে আজ, আপনি আমায় চেনেন না অমরবাবু—।"

কার যেন পায়ের সাড়া পাওয়া গেল তেতলার সিঁড়িতে।

ছবুলা চোখ তুলে দেখে রঞ্জন।

নিচে গোলমাল শুনে রঞ্জন দেখতে আসছিলো কী ব্যাপার।

"—রঞ্জন!" ছবুলা ডাকলো।

রঞ্জন ছুটে নেমে এলো।

"একি করছেন অমরবাবু। ডোণ্ট বি সিলি। ছেড়ে দিন ওকে। বড্ড বেশী ড্রিঙ্ক করেছেন আপনি। ডোণ্ট্ বি এ ফুল—।"

রঞ্জন ধ্বস্তাধ্বস্তি করে অমর চ্যাটার্জির হাত থেকে ছবুলাকে ছাড়িয়ে নিলো।

"আমার সঙ্গে এসো ছবুলা", বলে রঞ্জন ছবুলার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেল।

"আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমায়, চলো বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে—।"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি, আমার কোট আর দু'চারটি জিনিস উপরে আছে, ওগুলো নিয়ে নিই।"

অমর চ্যাটার্জি দাঁত বার করে হাসতে লাগলো।

"আমায় আগে বলা উচিত ছিলো রঞ্জন," সে বললো, "আমি জানতাম না যে উনি তোমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু—।"

রঞ্জন ছবুলাকে তেতলার একটি ঘরে নিয়ে এলো।

ছবুলা দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, "রঞ্জন, ও লোকটা আমায় এরকম অপমান করলো আর তুমি তাকে কিছু বললে না?"

"ওসব আর গায়ে মেখো না ছবুলা," রঞ্জন বললো, "ও বড্ড বেশী মদ খেয়েছে। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ও এরকম ব্যবহার কারো সঙ্গে করে না। ওসব কথা এখন,যাক। তুমি এখানে এলে কেন? আমি তো বলেছিলাম—", বলে থেমে গেল।

"কী বলেছিলে?"

রঞ্জন চট করে কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

"বলেছিলে তুমি আমার বাড়ি আসবে, এই তো? আসো নি কেন?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

রঞ্জন আমতা আমতা করে বললো, "আসছিলাম। ওরা আমায় মাঝপথে পাকড়াও করলো। আমি কিছুতেই—।"

"তুমি তেতলার এঘরে একা বসে কী করছিলে?"

মুখে রুমাল চাপা দিলো রঞ্জন।

"এঘরে এত খালি সোডার বোতল কেন?"

রঞ্জন অপ্রস্তুত হয়ে এদিক ওদিক তাকালো।

"এত রাত্তিরে তোমরা এক একজন এক এক ঘরে, কী ব্যাপার?"

রঞ্জন আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "এই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম,

এই কি। চ্যাটার্জির বাড়ি । আমাদের নিজের বাড়ির মতোই—।"

"সরমার সঙ্গে তুমি ওরকম অভদ্র ব্যবহার করলে কেন ?"

"আমি ? আমি না তো ? সে তো অমরবাবু -," বলে থেমে গেল।

ছবুলা বললো, "সবই জানো তাহলে ?"

"কিন্তু সে তো এমন কিছু নয়, এই একটুখানি হাত ধরে কী একটা কথা বলেছিলো, তাইতেই সে রাগ করে চলে গেল। তোমায় গিয়ে বলেছে বুঝি ? এই আজকালকার মেয়েরা এখনো এত সেকেলে !—"

"থাক, যথেষ্ট হয়েছে," ছবুলা গম্ভীর ভাবে বললো, "ভালোই হোলো। তোমায় চিনলাম। ছুদিন পরে হলে বড্ড দেরি হয়ে যেতো। তুমি যে এত বড়ো একটা অপদার্থ, আমি ভাবতে পারি নি।"

রঞ্জন অনুনয় করলো, "আমায় ভুল বুঝো না ছবুলা, আমি এদের এসব ব্যাপারের মধ্যে নেই।"

"তাহলে এদের কোন ব্যাপারের মধ্যে আছো ?"

রঞ্জন উত্তর দিলো না।

"এদের মধ্যে আছোই বা কেন ?"

রঞ্জন চুপ করে রইলো।

"আমি জানি, কেন। টাকার জন্যে। তাই না ? চ্যারিটির নাম করে সবাইকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা তুলে সেগুলো নিজেরা ভাগা-ভাগি করে নেওয়াই তোমাদের কাজ। এই তো ?"

রঞ্জন এবারও উত্তর দিলো না।

"আমি কী তোমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি ? অথচ একটু

আগে শুনলাম মনোহরদাস দত্তকে বলছে, আমায় দেওয়া হয়েছে পাঁচশো টাকা।"

রঞ্জন চট করে ভেবে নিয়ে উত্তর দিলো, "আমরা আজ মোটে স্থির করেছি তোমায় টাকা দেওয়া হবে। টাকাটা কাল আমিই দিয়ে আসতাম।"

"থাক, আমার দরকার নেই ও টাকার। তোমাদের টাকা ছুঁতেও আমার গা ঘিন ঘিন করবে। আর আমি তো টাকার জন্যে আসিনি। তুমি বলেছো বলেই এসেছিলাম।"

একটু চুপ করে থেকে রঞ্জন বললো, "বেশ, শোনো তাহলে। আজ খুলে বলছি তোমায়। জামাইবাবু মারা যাওয়ার পর লাইফ্ ইনসিওরের যে হাজার পাঁচেক টাকা দিদি পেয়েছিলেন সেগুলো দিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে আমারই ভুলে সব টাকা নষ্ট হয়। দিদি আজো জানে না। ছবুলা, আমায় যেমন করে হোক এ টাকা যোগাড় করে দিদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

"তাই বলে এভাবে?"

"টাকা যখন করতেই হবে তখন আর অতোশত ভাবা যায় না," রঞ্জন একটু উত্তপ্ত হয়ে বললো, "আমি না করলে অন্য কেউ করতো।"

ছবুলা চুপ করে রইলো একটুখানি।

তারপর বললো, "আমি চললাম।"

"চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।"

"না, তোমায় আসতে হবে না।"

"অনেক কথা আছে ছবুলা। পথে যেতে যেতে—।"

"আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না রঞ্জন।"

"কেন মিছিমিছি রাগ করছো—।"

"রাগ করি বা যাই করি, তার কৈফিয়ত আমি তোমার কাছে দিতে যাবো না। তোমায় শুধু একটা কথা বলছি—আমার কাছে তুমি আর মুখ দেখিও না কোনোদিন।"

রঞ্জন বললো, "দাঁড়াও, ছবুলা। শোনো। আজ তুমি যে জন্যে এত চটেছো, তার কারণ হোলো অমর চ্যাটার্জি। ওকে আমরাও কেউ পছন্দ করি না। আজই কথা হচ্ছিলো মনোহরদাসের সঙ্গে। আমরা অমরকে বাদ দিয়েই অন্য পরিকল্পনায় কাজে নামবার কথা ভাবছি। মনোহরদাস বলছিলো একটি নাটক স্টেজে সফল হলে সেটিকে ফিল্ম করবার কথা। ও চায় তোমারই পছন্দ করা কোনো নাটক। এই ব্যাপারে থাকবো শুধু আমি তুমি আর মনোহরদাস। আর কেউ নয়।"

"আমার যা বলার তাতো বলেছি রঞ্জন," ছবুলা উত্তর দিলো, "আমি আর কোনোদিন তোমার মুখ দেখতে চাই না।"

রঞ্জন ছবুলার পথ আটকে দাঁড়ালো।

বললো, "শোনো, ছবুলা। তুমি আবার কোথায় গিয়ে জুটবে তাতো জানি, কিন্তু তাতে কী লাভ হবে তোমার? এখানে মনোহরদাস আমাদের একটি অপূর্ব সুযোগ দিচ্ছে। দুদিনে আমাদের কপাল ফিরে যাবে ছবুলা। আমাদের এদিন আর থাকবে না।"

"পথ ছাড়ো রঞ্জন," ছবুলা বললো, "আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—।"

রঞ্জন বলে চললো, "বেশ, যাবেই যদি, যাওয়ার আগে শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। আমাদের এই ভালোবাসার কি কোনো দামই তোমার কাছে নেই, ছবুলা?"

রঞ্জন এক পা এক পা করে এগুতে লাগলো ছবুলার দিকে।

ছবুলা বললো, "পথ ছাড়ো রঞ্জন, পায়ের স্লিপার আজ একবার

ব্যবহার করেছি। প্রয়োজন হলে আরো একবার ব্যবহার করতে পারি।"

রঞ্জন আর কিছু বললো না।

পথ ছেড়ে দিলো।

বেরিয়ে গেল ছবুলা।

রাত তখন প্রায় এগারোটা।

হাত মুখ ধুয়ে এসে দীপক খেতে বসলো।

মীনা ভাতের থালাটা সামনে নামিয়ে দিয়ে একপাশে বসে পড়লো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "সকাল করে ফিরবে বলেছিলে, এত দেরি হোলো কেন ?"

দীপক একটু আনমনা ছিলো। প্রশ্নটা বোধ হয় শুনতে পায়নি। মীনা আবার জিজ্ঞেস করলো।

"কী বলছিস ? দেরি ? ও হ্যাঁ, পথে হঠাৎ ছবুলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"কোথায় ?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"পার্ক সার্কাসের কাছে," দীপক উত্তর দিলো। "ছবুলা ফিরছিলো অমর চ্যাটার্জির বাড়ি থেকে।"

"তারপর ?"

"দেখি আনমনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। তখন প্রায় পৌনে দশটা। ডাকলাম। প্রথমে শুনতে পায়নি। তারপর কাছে গিয়ে ডাকতেই ফিরে তাকালো। বললাম, চলো, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। এত রাত্তিরে একা বাড়ি ফেরা ঠিক হবে না। সে বললো, মাথাটা বড্ডো ধরেছে। চলো কোথাও ফাঁকায় গিয়ে

বসি। বসলাম গিয়ে পার্ক সার্কাসের ময়দানে একটি বেঞ্চিতে। কথাবার্তা বেশী কিছু হোলো না। শুধু বললে, রঞ্জনকে এদ্দিনে চিনলাম দীপক। আমি বললাম, যে আমরা ওর সব কিছুই জানতে পেরেছিলাম। শুধু তাকে বলিনি এজন্যে যে সে হয়তো ভাববে আমরা সব বানিয়ে বলছি তাদের মধ্যে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার জন্যে। প্রায় সাড়ে দশটা যখন বাজে, আমরা উঠে পড়লাম। ট্রামে গেলে দেরি হয়ে যাবে বলে ওকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিলাম।"

"বাড়িতে কিছু বলে নি ?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, ওর বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছবুলা তো অতো রাত করে কোনোদিন ফেরে না। আমি বললাম, ও আমাদের এখানে ছিলো অতোক্ষণ। ছবুলা কি বললে জানো ? বললে, না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লো না বাবা, তাইতে এতো দেরি হোলো। আমিও নিরুপায় হয়ে সায় দিলাম সে কথায়। ওর বাবা আর কিছু বললেন না।"

মীনা জিজ্ঞেস করলো, "ছবুলা বললে আমাদের এখানে খেয়েছে ? তার মানে আজ ওকে উপোস করে থাকতে হবে ?"

দীপক আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "তাতে বোধ হয় কিছু আসে যায় না, কারণ মনে হোলো আজ ওর মুখে কিছু রুচবে না।"

"তবু বেচারী আজ না খেয়ে থাকবে ?"

"তুই অতো ভাবছিস কেন ?"

"ওর মায়ের অসুখ বলেই ভাবছি। মায়ের অসুখ না থাকলে আমার ভাবনা হোতো না।"

দীপক আর কিছু না বলে চুপচাপ খেতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে বললো, "একটা ব্যাপার চোখে পড়লো— ।"

"কী ?"

"ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে যাচ্ছিলাম। একসময় লাল আলোর সামনে পড়ে রাস্তার চৌমাথায় গাড়ি থামতে পাশের একটি ল্যাম্প-পোস্টের আলো পড়লো ছবুলার চোখে। দেখি, ওর চোখ জলে ভাসছে। আমি বলতে ও মুখটা রুমাল দিয়ে পুঁছে নিলো। বোধ হয় নিজেই টের পায়নি যে চোখ দিয়ে জল পড়ছে।"

শুনে মীনা চুপ করে রইলো।

"এ রকম হতে পারে ?" দীপক জিজ্ঞেস করলো।

"কেন হতে পারবে না। দেখলে তো হোলো।"

"কিন্তু কেন ?"

মীনা হেসে জিজ্ঞেস করলো, "ছবুলা আর কি বললো ?"

"বিশেষ কিছু না। তবে আমার ধারণা হোলো সে আর রঞ্জনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। আমায় জিজ্ঞেস করছিলো আমাদের রিহার্স্যাল কবে থেকে শুরু। আমি বললাম, তুমি যেদিন আসবে সেদিন থেকেই শুরু করবো। কিন্তু কই, বললে না, ছবুলার ও রকম হোলো কেন ?"

"ছবুলা নিশ্চয়ই ভীষণ ভালোবাসে রঞ্জনকে।"

"সে কী করে হয়? সে তো বললে, রঞ্জন একটি অপদার্থ।"

"সে জন্যেই তো আরো বেশী ভালোবাসে।"

"কিন্তু সে তো রঞ্জনের মুখ আর দেখবে না বলেছে।"

"নাই বা দেখলো, তাই বলে কি ভালোবাসতে নেই ?"

"কিন্তু যে ছেলের জীবনে কোনো আদর্শ নেই, কাজে কোনো প্রিন্সিপ্‌ল্ নেই—।"

"আদর্শের আর প্রিন্সিপ্‌ল্‌-এর হিসেব কষে কে আর কবে ভালোবেসেছে দাদা ?"

"তাহলে সে রঞ্জনের সম্পর্ক ছাড়লো কেন ?"

"এ তো খুব সহজ ব্যাপার। ছবুলা শিল্পী, তার কাছে তার কাজের মূল্য অনেক বেশী। তার কাজের আদর্শে আর ভালোবাসায় যখন সংঘর্ষ বাধলো, সে তার ভালোবাসার পাত্রটিকে ছাড়লো। তবে তাকে সে ছাড়লো বটে, কিন্তু তার ভালোবাসাকে মুছে ফেলেনি, সেটি সে মনের মধ্যে পুষে রাখবে চিরকাল।"

"সে হতে পারে ?"

"না হলে পার্কে বসে ওরকম চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে দিতো না নিজের অজান্তে।"

দীপক চুপ চাপ খেতে লাগলো। আর কোনো কথা বললো না।

একবার মাছের কাঁটা বিধলো তার গলায়। কয়েক মুঠো শুকনো ভাত খেয়ে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে নিলো।

মীনা একটু হাসলো।

"দাদা, ভাত দিই আর দুটো ?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

"আর কি দোবো তাহলে ! মাছের ঝোল দিই একটু ?"

"না।"

"ডালনাটা ভাল হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আরেকটু দিই ?"

"না।"

মীনা হেসে গড়িয়ে পড়লো।

"হাসছিস যে ?"

মীনা হাসতে হাসতে বললো, "তোমার কী হয়েছে বলো তো? কী খাচ্ছো খেয়ালই নেই?"

"কেন?"

"বেশ তো বললে ডালনাটা ভালো হয়েছে। ডালনা খেলে কোথায়?"

এদিক ওদিক তাকালো দীপক, "নিশ্চয়ই খেয়েছি, তা নইলে সামনেই থাকতো।"

মীনা হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "ডালনা রাঁধিই নি। অমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"ও," একটু অপ্রস্তুত হোলো দীপক।

"দুধটা এখন দেবো, না শোয়ার আগে দেবো?"

"আমি আজ আর দুধ খাবো না, তুই খেয়ে ফেল।"

"আমার তো আছে।"

"তাহলে দই করে ফেল।"

"ওটুকু দুধে আর কতো দই হবে।"

এবার দীপক একটু বিরক্তি বোধ করলো।

বললো, "তাহলে বেড়ালটিকে দিয়ে দে।"

মীনা অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলো দীপকের দিকে। আস্তে আস্তে একটি হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

খাওয়া শেষ করে মুখ তুলতে দীপকের চোখে পড়লো মীনার এই হাসি।

অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে সে থালা ছেড়ে উঠে পড়লো।

সেদিন রঞ্জন মনোহরদাস আর অমর চাটুজ্যের সঙ্গে বসে প্রচুর মদ খেলো।

একটার পর একটার পর একটা এত খেলো যে মনোহরদাস পর্যন্ত বললো, "করছো কী রঞ্জন, এবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

"ওঃ, শাট্ আপ্," উত্তর দিলো রঞ্জন।

অমর চাটুজ্যে রঞ্জনের পিঠ চাপড়ে বললো, "ইউ আর এ ডার্লিং।"

"শাট্ আপ্," উত্তর দিলো রঞ্জন।

মুখ বিকৃত করে দত্তসায়েব বললো, "আমি আর পারছি না। বড্ড অসুস্থ বোধ করছি।"

"শাট্ আপ্।" রঞ্জন তাকেও ধমকালো।

অনেক রাত হতে মনোহরদাস বললে, "চলো, এবার উঠি।"

রঞ্জন টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো। মনোহরদাসের কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজার কাছে এসে আবার ফিরে দাঁড়ালো।

বললো, "দাঁড়াও, একটা কাজ বাকী আছে।"

মনোহরদাস একটু অবাক হয়ে রঞ্জনের দিকে তাকালো। বেশ সহজ তার কথা বলা। কোনো জড়তা নেই।

রঞ্জন ফিরে এলো অমর চ্যাটার্জীর কাছে।

বললো, "ওঠ্। উঠে দাঁড়া।"

অমর চ্যাটার্জীর অবস্থা তখন খুবই কাহিল। নিস্পন্দ হয়ে এলিয়ে পড়েছিলো একটি সোফার উপর।

"চশমাটা খোল্", রঞ্জন সিংহ গর্জন করলো।

রঞ্জনের হাঁক শুনে অমর চ্যাটার্জী চোখ খুলে একটু তাকালো।

তারপর চোখ বুঁজলো আবার।

রঞ্জন তার কলার ধরে টেনে তুললো। তারপর হঠাৎ তাকে চড় মারতে শুরু করলো ডান হাতে বাঁ হাতে।

চশমাটি ছিটকে পড়লো ঘরের মেঝেতে।

আট দশটা চড় খেয়ে অমর চ্যাটার্জী সোফার উপর নেতিয়ে পড়লো।

দত্তসায়েবের মুখ তখন ছাই হয়ে গেছে। চোখ বড়ো করে তাকিয়ে আছে রঞ্জনের দিকে।

দরজার কাছে মনোহরদাস চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মুখে তার মৃদু হাসি।

রঞ্জন অমর চ্যাটার্জীর কলার ধরে তাকে আবার টেনে তুললো। তারপর একটা ঘুষি মারলো মুখের উপর। সে গড়িয়ে গিয়ে পড়লো ঘরের এক কোণে।

রঞ্জন তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। মনোহরদাস এসে তার হাত ধরে বললো, "ব্যস, অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার চলো।"

আবার কেমন যেন নেশার তন্দ্রিমা নামলো রঞ্জনের চোখে।

মনোহরদাসের কাঁধে হাত দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো। জড়িমা দেখা দিলো তার কথায়। বললো, "বেশ শিক্ষা দিয়েছি জানোয়ারটাকে। যে ছবুলাকে অপমান করবে, তাকেই ঠিক এমনি করে মার দেবো। কিন্তু বেটাচ্ছেলে এখন বেহুঁশ। এ শিক্ষা তার জীবনে কোনোদিনই মনে থাকবে না।"

একটু চুপ করে থেকে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, "আর ছবুলাও জীবনে কোনোদিন জানবে না যে তার অপমানের খানিকটা শোধ নিলাম"

তখন রাত বারোটা।

ঘুম নেই ছবুলার চোখে।

নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে সেতারটি পেড়ে নিয়ে সে তখন দরবারী কানাড়া ধরেছে।

বাইরে নিস্তব্ধ অন্ধকার।

শুধু একটি ভিখারী ছেলে তখন ঘুমে ঢুলছে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টে হেলান দিয়ে।

আর অনেক দূরে একটি রেলগাড়ি চলে গেল টালিগঞ্জ ব্রিজের উপর দিয়ে।
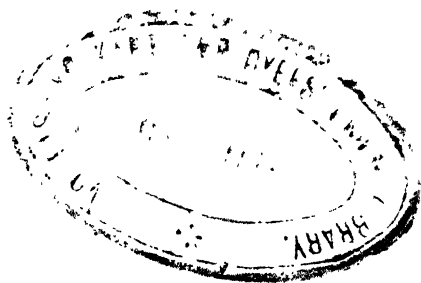
ছবুলা বেরুনোর আগে ওর মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

"তোমার শরীর এ বেলা কেমন আছে মা?" সে জিজ্ঞেস করলো।

মা একটু হাসলেন।

বললেন, "ভালোই। তোদের বই কটায় আরম্ভ?"

"সাড়ে ছটায়।" ছবুলা ঘড়ির দিকে তাকালো। "ওরে বাবা, সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখনই বেরিয়ে না পড়লে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তোমার আর কিছু চাই?"

"না।"

ছবুলার বাবা কাছেই বসেছিলেন একটি মোড়ার উপর।

ছবুলা বললো, "বাবা, ঠিক ছটায় মাকে ওষুধটা খাইয়ে দিও। আমি ফিরবো সাড়ে নটার মধ্যেই।"

বাবা চুপ করে রইলেন। কোনো উত্তরই দিলেন না।

"সবাই তোদের থিয়েটার দেখছে," ছবুলার মা আস্তে আস্তে বললেন, "শুধু আমারই দেখা হয়ে উঠলো না।"

"তুমি আরেকটু সেরে ওঠো, মা, তারপর যেটি হবে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়ে আনবো। এখন তো তুমি অনেক ভালো হয়ে গেছ, আর কিছুদিনের মধ্যেই বাইরে বেরুতে পারবে। ডাক্তার তো কালই বলছিলো। আমি বেরিয়ে পড়ি এই বেলা।"

"বেশী রাত করিস নে।"

"না মা, যেই শেষ হবে, অমনি চলে আসবো।"

ছবুলার বাবা কোনো কথাই বললেন না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ছবুলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ পর কে যেন এসে দরজায় কড়া নাড়লো।

ছবুলার বাবা দরজা খুলে দেখলেন, কে একজন যেন, চেনা মুখ, তবে নামটা মনে পড়ছে না।

"ছবুলা আছে?"

"না, বেরিয়ে গেছে।"

"কোথায় গেছে বলতে পারেন?"

"কেন, আপনি শোনেন নি? আজ ওদের একটি নাটক হচ্ছে।"

"কোথায়?"

শিবপদবাবু একটু অবাক হলেন।

বললেন, "ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে।"

"ও। আচ্ছা।"

"আপনাকে তো আগে দেখেছি, আপনার নামটা?" জিজ্ঞেস করলেন শিবপদবাবু।

"আমি—আমি রঞ্জন।"

নাটকটি লিখেছে বিমল সাহা। নাম,—"কাজি বাগান বস্তি।"

প্রযোজনা করছে দীপক মিত্র।

প্রধান ভূমিকায় ছবুলা।

তখন তৃতীয় দৃশ্য চলছে।

—শহরে লোক বেড়ে গেছে। তাই বেড়ে যাচ্ছে ফ্ল্যাটের চাহিদা।

বস্তির মালিক স্থির করেছে বস্তি ভেঙে ফেলে পাঁচতলা ম্যানশান তুলবে। উঠে যেতে নোটিস দিয়েছে বস্তির অধিবাসীদের।

তারা ভেবে পাচ্ছে না ধনী মালিকের এই অন্যায়ের প্রতিকার কোথায়।

এদ্দিনকার বসবাস ছেড়ে কোথায় গিয়ে উঠবে এই দুর্দিনে?

দুর্ভিক্ষের মৌসুম চলেছে। ভিখারীর ভিড়ে ফুটপাথেও জায়গা নেই।

লেদ্-মিস্ত্রি রসিক হাজরার বৌ যমুনা উদ্দাম উৎসাহে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করছে বস্তির অধিবাসীদের, সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করছে প্রতিরোধ আন্দোলন। রসিক হাজরার ঘরের সামনের একফালি উঠোনে বস্তির মোড়লদের মজলিস।

যমুনা তাদের বোঝাচ্ছে—

রঞ্জন এসে দেখলো খুব ভিড়।

সবাই তাকে চেনে। কেউ তার পথ আটকালো না। সে ভিতরে এলো, কিন্তু ভিড়ের জন্যে হলের ভিতর ঢুকতে পারলো না।

বাইরে প্যাসেজে একটি জানলার পাশে দাঁড়িয়ে একটি সিগারেট ধরালো।

যমুনার ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে ছবুলা প্রেক্ষাগৃহ তড়িতায়িত করলো।

মীনা উইঙস্-এর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। তার ভূমিকা আরো দুটো দৃশ্যের পর। প্রধান ভূমিকা ছবুলার, কিন্তু নাটকের নায়িকা মীনা।

"তুমি এখানে?"

মীনা ফিরে তাকিয়ে দেখে বিমল।

"একটু এদিকে এসো," বিমল বললো।

ওর পেছন পেছন মীনা নেমে এলো স্টেজ থেকে। সাজঘরের বাইরে প্যাসেজের শেষে যে দরজাটি, বিমল সেখানে এসে দাঁড়ালো।

"কী ব্যাপার, ডাকলে কেন?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

বিমল দরজাটি একটুখানি খুলে বললো, "ওই দেখ —।"

মীনা দেখলো উঁকি মেরে।

দেখলো, বাইরের প্যাসেজে জানলার পাশে একা দাঁড়িয়ে রঞ্জন সিগারেট টানছে।

"ওকে দেখতে পেয়ে তোমায় ডাকলাম," বিমল বললো, "ও বুঝি আবার ছবুলার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করছে?"

"এবার এখান অবধি ধাওয়া করেছে দেখছি," মীনা উত্তর দিলো।

বিমল মীনার কাছে ব্যাপারটা শুনলো।

সম্প্রতি রঞ্জন আবার ছবুলার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে। পেরে উঠছে না কিছুতেই। ছবুলা সব সময় রঞ্জনের নাগালের বাইরে রাখছে নিজেকে।

দীপক ছবুলাকে বলেছিলো, তুমি যদি বলো তো রঞ্জনকে ধরে এমন শিক্ষা দিই যে সে আর তোমার ধারে কাছে ঘেঁষবে না।

কিন্তু ছবুলা রাজী হয়নি। সুতরাং নিরস্ত হতে হয়েছিলো দীপককে।

ছবুলা বলেছিলো, রঞ্জনের সঙ্গে যেন কোনো রকম অভদ্রতা করা না হয়।

শুনে বিমল বললো, "কিন্তু ওকে এখানে ঢুকতে দিলো কে? নিশ্চয়ই টিকিট করে আসে নি।"

"দাঁড়াও, দাদাকে গিয়ে বলি।"

ওরা দীপককে খুঁজতে খুঁজতে আবার স্টেজে গিয়ে উঠলো।

তখন তৃতীয় দৃশ্য শেষ হয়েছে। চতুর্থ দৃশ্যের সেট সাজানো হচ্ছে। দীপক ভয়ানক ব্যস্ত।

"দাদার দেখছি কারো দিকে তাকানোর সময় নেই," মীনা বললো, "পরের সীনটা আরম্ভ হোক, তারপর বলবো।"

সেট প্রস্তুত হোলো। পরবর্তী দৃশ্য আরম্ভ হবো হবো।

এমন সময় একটি ছেলে স্টেজে এসে ঢুকলো। সোজা এগিয়ে গেল ছবুলার কাছে। তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কী একটা কথা বললো খুব আস্তে আস্তে।

কালো হয়ে গেল ছবুলার মুখ।

অতি কষ্টে যেন সংবরণ করলো কোনো একটা মনোভাব। মুখে কিছু বললো না।

বেল পড়লো। সবাই সরে গেল মঞ্চ থেকে।

ড্রপ্ উঠলো। অভিনয় শুরু হোলো।

কোথায় মিলিয়ে গেল ছবুলার মুখের ম্লানিমা। যমুনার ভূমিকা আবার দীপ্ত হয়ে উঠলো।

দীপক উইঙস্-এর পাশে একাগ্রমনে দাঁড়িয়ে।

"দাদার তো নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই," বললো মীনা, "এখন থাক। বই শেষ হলে বলা যাবে, কেমন?"

বই শেষ হোলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। শেষ হতেই ছবুলা দীপককে আড়ালে ডেকে নিয়ে কী যেন বললো। গম্ভীর কালো হয়ে গেল দীপকের মুখ।

ছবুলা চলে গেল সাজঘরে। খুব অল্পসময়ের মধ্যে জামাকাপড় বদলে মুখের মেক আপ মুছে বেরিয়ে এলো।

দীপক তখন স্টেজের একপাশে দাঁড়িয়ে খুব গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছে।

মীনা আর বিমল ওর কাছে এগিয়ে এলো।

মীনাকে দেখে কী একটা কথা বলবার জন্যে দীপক মুখ খুললো। এমন সময় কাছে এসে দাঁড়ালো ছবুলা।

খুব মৃদু গলায় বললো, "আমি যাচ্ছি।"

দীপক আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আমি সঙ্গে আসবো?"

"না, দরকার নেই", বিষণ্ণ উত্তর এলো ছবুলার, "এদিকে অসুবিধে হবে।"

ছবুলা মীনা আর বিমলের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কোনো কথা বললো না ওদের সঙ্গে।

"ছবুলার কী হোলো আবার?" বিমল জিজ্ঞেস করলো।

উত্তর দেওয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার মুখ খুললো দীপক। কিন্তু এবারও উত্তর দেওয়ার আগে বাধা পড়লো।

অন্য দিক থেকে রঞ্জন হন হন করে এগিয়ে আসছিলো।

ছবুলা তখন সাজঘরের বাইরের প্যাসেজের দরজাটি ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

তাকে দেখে রঞ্জন এগিয়ে চললো তার দিকে।

এদের পাশ কাটানোর উপক্রম করতেই দীপক তার হাত ধরে থামালো।

বললো, "ছবুলাকে একাই যেতে দাও রঞ্জন, ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাইরে ওর লোক অপেক্ষা করছে। আজ ওকে বিরক্ত কোরো না।"

রঞ্জন ফিরে তাকালো দীপকের দিকে।

ভুরু কুঁচকে বললো, "এসব আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার দীপক। তুমি এর মধ্যে মাথা গলাতে এসো না। হাত ছাড়ো।"

দীপক উত্তর দিলো, "তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কোনো কৌতূহল নেই। আমি শুধু বলছিলাম আজকের দিনটা থাক। অন্তত আজ ছবুলাকে বিরক্ত কোরো না।"

"কেন ?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

দীপক আস্তে আস্তে বললো, "আজ সন্ধ্যেবেলা ছবুলার মা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন।"

রঞ্জনের হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়লো দীপকের হাত থেকে।

বিমল আর মীনা পাথর হয়ে গেল।

প্রথম কথা বেরুলো মীনার মুখ থেকে অনেকক্ষণ পর। জিজ্ঞেস করলো, "খবরটা পেলে কখন ?"

"চতুর্থ দৃশ্যটা আরম্ভ হবার একটু আগে।"

মীনার মনে পড়লো। কে একজন এসে কী একটা খবর দিয়েছিলো ছবুলাকে। সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো আলোর দিক থেকে অন্ধকারে।

কিন্তু—কিন্তু তারপর আবার সহজভাবে অভিনয়টা করলো কী করে ? আর করলোও তো আশ্চর্য রকম ভালো—মীনা ভাবলো।

দীপক বললো, "ও কাউকে জানতে দেয় নি তখন। আমায় বললো বইটা শেষ হবার পর।"

"শোনামাত্র চলে যায়নি কেন," বিমল জিজ্ঞেস করলো।

"তাহলে নাটক বন্ধ হয়ে যেত, বিমল," দীপক উত্তর দিলো, "সেটা সে চায়নি।"

রঞ্জন আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে।

রঞ্জনের সঙ্গে এদের আবার দেখা হোলো ঠিক দিন পোনেরো পর।

বিমল, দীপক আর মীনা মীনাদের বাড়ি বসে গল্প করছিলো।

এমন সময় রঞ্জন ঝড়ের মতো এসে ঢুকলো।

জিজ্ঞেস করলো দীপকের সামনে দাঁড়িয়ে, "ছবুলা কোথায় ?"

দীপক তাকিয়ে দেখলো রঞ্জনের দিকে।

তারপর উত্তর দিলো, "আমায় জিজ্ঞেস করছো কেন ? ওদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলেই পারো।"

"সেখানে ওরা নেই," রঞ্জন বললো, "ওখান থেকে উঠে গেছে দিন দুই আগে।"

দীপক কোনো উত্তর দিলো না। কোনো ঔৎসুক্যও প্রকাশ করলো না এই সংবাদে।

"তুমি বলতে চাও তুমি জানো না সে এখন কোথায় থাকে।"

দীপক এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিলো না।

উত্তর দিলো মীনা।

বললো, "হয়তো জানি। কিন্তু আপনাকে জানাতে মানা আছে রঞ্জনবাবু।"

শুনে রঞ্জন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললো, "কিন্তু ছবুলার খোঁজ কেন করছি সেটা যদি জানতেন, তাহলে এ মানা শুনতেন না। ছবুলাকে একটা খবর দেওয়ার আছে।"

"বেশ তো। আমাদের বলুন না, আমরা দিয়ে দেবো খবরটা।" মীনা বললো।

রঞ্জন মাথা নাড়লো।

ম্লান হেসে বললো, "সেকথা সবাইকে বলা যায় না। আমায় ভুল বুঝবেন না। আমার নিজের ব্যাপার হলে বলতাম। এ অন্য ব্যাপার। তাই বলা সম্ভব নয়। যাক, আমি নিজেই খুঁজে নেবো তাকে। কিছুদিন সময় নেবো, এই মাত্র।"

রঞ্জন চলে গেল।

বিমল বললো, "ছবুলারা ওবাড়ি ছেড়ে দিয়েছে জানতাম না তো! উঠে গেল কেন?"

মীনা উত্তর দিলো, "বাড়িওয়ালা তুলে দিয়েছে। ছ মাসের ভাড়া নাকি বাকী পড়ে ছিলো। এরা যে এত বছরের ভাড়াটে সে কথা একবার ভাবলোও না। আর ছবুলাই বা কী রকম। আমাদের ও বললো না একবারও। বললে বাকী ভাড়ার টাকাটা চেষ্টা চরিত্র করে যোগাড় করে দেওয়া যেতো। একেবারে বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়িতে উঠে তারপর জানালো আমাদের।"

"ওদের অবস্থাও অনেক খারাপ হয়ে গেছে আগের থেকে," দীপক বললো। "ভালো কোনো দিনই ছিলো না। কিন্তু ওর বাবার চাকরি চলে গেল কিছুদিন আগে। তারপর থেকে ছবুলাই চালাচ্ছে ওই সংসার। ওর মা মারা যাওয়ার পর থেকে ওর বাবার কি রকম একটু মাথার গোলমাল হয়েছে। ভদ্রলোক বোধ হয় আর সংসারের কোনো কাজে আসবেন না!"

কেউ আর কোনো কথা বললো না অনেকক্ষণ।

বিমল তার কলম দিয়ে একটি সাপ্তাহিকের কভারের উপর হিজিবিজি কাটতে লাগলো।

দীপক চুপচাপ তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে।

মীনা চোখ তুলে একবার দীপকের দিকে তাকালো, তারপর বিমলের দিকে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের আর চা লাগবে?"

কেউ কোনো উত্তর দিলো না।
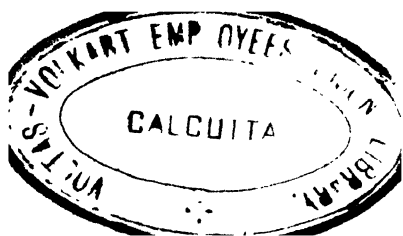
মেঘে মেঘে গুমোট হয়ে আছে।

ছবুলা একা জানলায় দাঁড়িয়েছিলো।

বস্তি অঞ্চলের নতুন পরিবেশটা কিছুই খারাপ লাগে না। চারদিকের দৈন্যের মধ্যে নিজেদের দৈন্যও আর গায়ে লাগে না। একটা দুটো করে ভদ্র পরিবারও ইদানিং এসে যাচ্ছে এ অঞ্চলে। দূরে কলতলায় ছোটো বাচ্চা আর বাচ্চার মায়েদের কলকণ্ঠ সোরগোল।

এখানকার বাচ্চাদের নিয়ে একটি স্কুল করলে কী রকম হয়, ছবুলা ভাবলো।

দূর থেকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে এলো ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দাড়িওয়ালা একটি লোক।

সঙ্গে একটি ছোটো মেয়ে। মাথায় তার সস্তা রেশমী রুমাল বাঁধা, তাতে একটুখানি জরির কাজ। ডাগর চোখে কালো কাজল, পরনে একটি ব্লাউস আর ঘাঘরা, পায়ে সস্তা ঘুঙুর।

রাত্তিরে কালীঘাটের দিকে ভিক্ষে করতে যাওয়ার সময় এপথ দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে যায়। হাজরা পার্কের ওদিক থেকে কালীঘাটের দিকে যাওয়ার একটা শর্টকাট আছে বস্তির ভেতর দিয়ে।

এদের গান শুনতে ছবুলার খুব মজার লাগতো। এই পরিবেশে বেশ মিষ্টিও লাগতো। মেয়েটির রিণরিণে গলা, চড়ার দিকে উঠলেই গলা ধরে যায়, তবু সঙ্গের লোকটা স্কেল নামিয়ে বাজাবে না। সুতরাং সেই চড়া স্কেলেই গায় মেয়েটি! 'শ' উচ্চারণ করতে পারে না, সব 'স'-'শ'-ই ওর কাছে "S"। মাঝে মাঝে হেঁড়ে

গলায় দাড়িওয়ালা লোকটিও গলা মেলায়। বেশ লাগে শুনতে, এদের হাল্কা গজলের সুরে গান গাওয়া। প্রত্যেকদিন শুনে শুনে ছবুলারও মুখস্থ হয়ে গেছে লাইনগুলি :

পরদেশিয়ার ভালোবাসা
পেয়ে বিষের জ্বালা রে,
তবু গানের সুরে সুরে
গাঁথি আমার মালা রে।—

পরদেশিয়ার ভালোবাসা নিয়ে কতোজন যে কতো গানই লিখে গেল আর গেয়ে গেল, ছবুলা ভাবতো, সেই ঘুরে ফিরে একই কথা, একই পুরনো কথা। তবু একঘেয়ে পুরনো নয় আধুনিক বাংলা গানের মতো, প্রাণ ঢেলে এত দরদ দিয়ে গায় এরা। নিজেদের অভিজ্ঞতার আওতা থেকে এক আধটু বাস্তবতার ছোঁয়াও আনে :

কারখানাতে ছুটির বাঁশি
বাজে যখন ছুটে আসি—
সে চলে যায়, চায় না ফিরে,
ডাক শোনে না কালা রে,…

কারখানাতে ছুটির বাঁশি! নিশ্চয়ই এ লোকটার নিজের লেখা।

হয়তো কোনো এককালে কাজ করতো এক কারখানায়।

কে জানে কোন পথের ধারে কোন পথের মেয়েকে পেয়ে গিয়েছিলো জীবনে, আজ সে নেই, তার ছোটো মেয়েটি আছে। কবে কোন ছাঁটাইয়ের ঝড়ে নিজের জীবনের বাঁধারুজির নিরাপত্তাও উড়ে চলে গেছে।

ভাঙা হারমোনিয়াম নিয়ে, মেয়ের পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে সে আজ পথে নেমেছে।

ছবুলা স্থির করলো যে বিমলের নতুন নাটকে এ রকম একটি চরিত্র তৈরী করতে বলবে তাকে।

গজলের সুর ক্রমশ দূরান্ত হয়ে এলো।

ছবুলা ঘরের ভিতর ফিরে এসে পাটির উপর বসে সেতারটি তুলে নিলো।

একটি গৎ বাজাতে শুরু করলো আস্তে আস্তে।

বেশ নিস্তব্ধ ছিলো চারদিক।

হঠাৎ পথের ভাঙা খোয়ার উপর ঠক ঠক জুতোর আওয়াজ।

সে যে এতো শ্রুতিকটু হতে পারে এ পাড়ায় আসবার আগে ছবুলা কোনোদিন অনুভব করে নি। আর এ আওয়াজ শুধু শর্ট-কাট যাত্রী ভদ্রলোক পথিকদের পায়ের জুতোর।

বড়ো রাস্তা থাকতে এপাড়ার ভেতর দিয়ে কেন যে শর্টকাট করে এরা, ছবুলা ভাবলো।

বিরক্তির মাথায় গৎটা খুব জলদে বাজাতে শুরু করলো সে।

জুতোর শব্দ বাড়িটা পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো।

হঠাৎ থামলো।

তারপর ফিরে এলো।

থামলো এসে ছবুলার বাড়ির সামনে।

তারপর দরজায় করাঘাত।

কে আবার?

দীপক কিংবা বিমল নিশ্চয়ই। ছবুলা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো। খুলে দেখে—

—রঞ্জন।

ছম্ করে যেন থেমে গেল ছবুলার হৃদয়ের স্পন্দন।

রঞ্জন হাসলো।

"আমি ঠিকই ভেবেছিলাম", বললো সে।

"আবার কী মতলব ?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো, "তোমায় মানা করি নি ?—"

ছবুলার কথা রঞ্জন কানে তুললো না।

বললো, "শর্টকাট করছিলাম এদিক দিয়ে। সেতার শুনে মনে হোলো হাতটা যেন চেনা। জানলার কাছে এসে দেখি, হ্যাঁ, তুমিই। এদ্দিন খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমায়, কে জানতো হঠাৎ এভাবে—"

"রঞ্জন," ছবুলা আস্তে আস্তে বললো, "আমি কোনোরকম অভদ্রতা করতে চাই না। তুমি দয়া করে চলে যাও।"

"অতো ভয় কিসের, ছবুলা ?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

"ভয় ? মাথা খারাপ ? ভয় পেতে যাব কেন ? তোমাকে ভয় ?"

"আমাকে নয়। ভয় তোমার নিজেকে," রঞ্জন উত্তর দিলো।

হঠাৎ কোনো কথা এলো না ছবুলার মুখে। লক্ষ্য করলো রঞ্জন কী রকম যেন একটু বদলেছে। গম্ভীর হয়ে গেছে অনেক। আগের চপলতা নেই।

"তোমায় অনেকদিন ধরে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, ছবুলা," রঞ্জন বললো।

ছবুলা এবারও কোনো উত্তর দিলো না।

"আমায় বস্‌তে বলবে না ?"

ছবুলা মাথা নাড়লো।

"বেশ, বোলো না। কিন্তু একটা কথা বলবার জন্যে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কী কথা ?"

"আমার কোথায় ভুল হয়ে গেছে সে কথা আজ বুঝেছি ছবুলা। কয়েকটা ঘা খেয়ে বুঝেছি। যে চোখ দিয়ে জীবনটাকে দেখতাম, সে চোখ বদলে গেছে।"

"বদলানো কি অতো সহজ, রঞ্জন," ছবুলা মৃদু হেসে বললো।

"তুমি চলে যাওয়ার পর—,"

"—অমনি চোখ খুলে গেল? সে হয় না রঞ্জন।"

"মানুষ বদলায় না বলতে চাও?"

"হ্যাঁ, বদলায়। কিন্তু যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বদলায়, যে আগুনে পুড়ে তার মন অন্য গঠন নেয়, সে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তোমার নয়, সে আগুন তোমার চারদিকে এখনো জ্বলে ওঠে নি। আমায় ফাঁকি দিতে এসো না রঞ্জন। আমি তোমায় চিনি।"

রঞ্জন একটু চুপ করে রইলো।

তারপর বললো, "যাক, বিশ্বাস যখন করছো না, তখন আর ওকথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। তবে একটা কথা বলতে পারি। মনোহরদাসের সঙ্গে ছিলাম এদ্দিন, এখনো আছি। তবে শিগ্‌গিরই ওকে ছেড়ে চলে আসবো। ও আমায় এত ব্যাপারে এত ফাঁকি দিয়েছে যা আমি কোনোদিন আশা করতে পারি নি।"

"তুমি ওকে কোনো রকম ফাঁকি দাও নি?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"না তো, আমি ফাঁকি দিতে যাবো কেন?" সে অবাক হয়ে বললো।

"আমায় দেখিয়ে তাকে তুমি হাত করবার চেষ্টা করো নি? যাক সে কথা। ও ফাঁকি দিয়েছে বলে ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ ও যে শ্রেণীর লোক, ফাঁকি দেওয়া সেই শ্রেণীবিশেষের চরিত্র-ধর্ম।"

"দোষ আমার", রঞ্জন আস্তে আস্তে বললো, "কারণ আমি না বুঝে ওর হাতের পুতুল হয়ে ছিলাম। আমি আর ওর সঙ্গে থাকবো না।"

ছবুলা হাসলো। কিছু বললো না।

রঞ্জন বলে গেল, "অন্য কোনো পেশা আমার পোষাবে না, আর একা কিছু নতুন গড়ে তোলা আমার সামর্থের বাইরে। এখন তুমি যদি আমায় তোমার দলে নাও, তাহলে—"

"আমাদের এসব পেশা নয় রঞ্জন, এখানেও তোমার পোষাবে না।"

"আমি পেশার জন্যে তোমাদের দলে আসতে চাইছি না, ছবুলা। কাজের জন্যে আসতে চাইছি। যে কাজে তোমরা নেমেছো, সে কাজে আমাকেও যদি সঙ্গে নাও—"

ছবুলা আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো।

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো রঞ্জন।

"তুমি পারবে না।"

রঞ্জন চুপ করে রইলো একটুখানি।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কেন পারবো না?"

"তোমায় কী করে বিশ্বাস করি?"

"কেন?"

"তোমার মন, তোমার দৃষ্টিভঙ্গী যতক্ষণ না বদলাচ্ছে—"

"আমি তো বললামই—"

"তোমার মুখের কথাই প্রমাণ নয়," ছবুলা বললো।

রঞ্জন একটু ভাবলো।

তারপর বললো, "আচ্ছা, যদি কোনোদিন প্রমাণ দিতে পারি?"

"সেদিন হয় তো আমারও মত বদলাবে।"

"বেশ—"

তার কথায় বাধা দিয়ে ছবুলা বললো, "তবে একথা মনে রেখো রঞ্জন, এ অতো সহজ নয়।"

"তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো না ছবুলা ?"

"না।"

রঞ্জন কোনো উত্তর দিলো না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে পা বাড়ালো।

বাইরে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালো।

বললো, "ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি।"

"যাক, নাই বা বললে," নিস্পৃহ উত্তর এলো।

"এটা আমার নিজের কথা।"

"তোমার নিজের কথায় আমার কোনো কৌতূহল নেই রঞ্জন," ছবুলা বললো।

"বেশ, মানা করছো যখন, বলবো না," রঞ্জন উত্তর দিলো, "তবে কথাটা বলতে চাইছিলাম এ কারণে যে আমার মনে হয়েছিলো আমার সম্বন্ধে তোমার একটি ভয় ঘুচিয়ে দেওয়া দরকার।"

"ভয়? কিসের ভয় ?"

"মনে হোলো তুমি হয় তো ভাবছো যে তোমার সঙ্গে আবার আগের সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনতে চাইছি—"

বলতে বলতে রঞ্জন আবার ঘরের মধ্যে উঠে এলো।

ছবুলা পেছিয়ে গেল দু তিন পা।

রঞ্জন বললো, "তবে তুমি শুনতে চাও বা না চাও, আমি বলবোই—।"

ছবুলা যেন আঁচ করতে পারলো রঞ্জন কী বলতে চায়। তার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ছবুলার মুখ।

বুক তার তুরতুর করে উঠলো।

"না, না, রঞ্জন, বোলো না। আমি শুনবো না। তুমি চলে যাও—।"

"না, আমি বলবোই—"

"রঞ্জন—!"

"আমি শুধু একথাই বলতে চাই যে, তুমি আমায় ভালোবাসো কি না বাসো আমার কিছু আসে যায় না, শুধু আমি যে তোমায় ভালোবাসি সেটাই আমার জীবনের একমাত্র সুখ।"

কী হোলো ছবুলার, সে নিজেই বুঝে উঠতে পারলো না।

মুখ ঢাকলো তুহাতে।

রঞ্জন বলে গেল, "আমি আগে এত ভালো বুঝিনি নিজেকে, যেদিন তুমি চলে গেলে সেদিন বুঝলাম। আর এই ভালোবাসার অনুভূতিই আমার চোখ খুলে দিলো পৃথিবী সম্বন্ধে। তবে তোমার জীবনের সঙ্গে আমি আর নিজেকে জড়াবো না কোনোদিন, এ আশ্বাস দিয়ে গেলাম।"

ছবুলার দিকে তাকিয়ে দেখলো সে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। হাত তুটো নামিয়েছে মুখের উপর থেকে। গম্ভীর নিস্পৃহ তার মুখ, প্রশস্ত তার দৃষ্টি।

সে আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে বসে পড়লো মাতুরের উপর, বসে পড়ে সেতারটি তুলে নিলো।

রঞ্জন বললো, হাল্কা, সহজ হবার চেষ্টায়, "জানো, আজকাল আমি গান লিখছি। লিখে তাতে সুর দিচ্ছি।"

"সে কথা আমায় জানিয়ে লাভ কি," ছবুলা বললো, "তোমার গান আমার ভালো লাগবে না।"

রঞ্জন একটু হেসে উত্তর দিলো, "যেদিন শোনাবো, সেদিন তুমি কেন, সেদিন সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবে।"

ছবুলা কোনো উত্তর দিলো না।

রঞ্জন একটু চুপ করে থেকে বললো, "আমি চললাম ছবুলা। আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে, তবে সে অনেক দিন পর।"

ছবুলা ফিরেও তাকালো না।

রঞ্জন বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

শুনলো ছবুলা সেতারে চন্দ্রকোশ বাজাচ্ছে।

বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি।

রঞ্জন যেতে যেতে শুনলো সেতারে চন্দ্রকোশের গৎ বাজছে অত্যন্ত জলদে।

হাওয়ায় তখন সবে মাত্র শীতের আমেজ লেগেছে। বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়ছে ভোরের দিকে। সকাল সাড়ে আটটায়ও রোদ্দুর বেশ স্নিগ্ধ।

বাজার করে বাড়ি ফিরে এসে ছবুলা দেখে দীপক ঘরের ভিতর তক্তপোশের উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে।

ছবুলা তার ছোটো ভাইটিকে ডেকে তার হাতে বাজারের থলিটি দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিলো। তারপর বললো, "তুমি হঠাৎ কোত্থেকে ?"

"অনেকদিন তোমার কোনো খোঁজ খবর নেই", দীপক উত্তর দিলো, "তাই আজ সকালে উঠেই স্থির করলাম এখানে এসে উপস্থিত হবো। মীনা কয়েকদিন ধরে তোমার কথা জিজ্ঞেস করছে। আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা চাকরি করেন চা বাগানে। তিনি একটি মস্তোবড়ো টিন ভর্তি চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার খানিকটা মীনা পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার জন্যে।"

ছবুলা দেখলো তক্তপোশের এক পাশে একটি কাগজের মোড়ক। অন্তত তিন পাউণ্ড চা নিশ্চয়ই আছে তার মধ্যে।

দীপক বললো, "চা তো বয়ে আনলাম। এবার আমায় খাওয়াবে তো এক কাপ ?"

ছবুলা হেসে উত্তর দিলো, "দুধ চিনি থাকলে নিশ্চয়ই খাওয়াবো। কালই তো এনেছি। বোধ হয় এখনো ফুরোয় নি। বোস। তোমার নিশ্চয়ই খুব তাড়া নেই।"

"কিচ্ছু না, যতক্ষণ না তাড়াচ্ছো, উঠছি না।"

"আচ্ছা, বোসো। আমি আসছি এক্ষুনি।"

ছবুলা ভেতরে চলে গেল। তারপর বেরিয়ে এলো তুটো বালতি নিয়ে

বললো, "একটু বোসো, আমি এই যাবো আর আসবো।"

"আবার কোথায় চললে," দীপক জিজ্ঞেস করলো।

"এই তো কাছেই", বলে ছবুলা বেরিয়ে গেল।

দীপক একটি মাসিকপত্র তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো।

ছবুলা ফিরলো প্রায় মিনিট পোনেরো পর। তু হাতে তু বালতি জল।

"জল আনতে গিয়েছিলে?" দীপক জিজ্ঞেস করলো, "কেন কলে জল নেই?"

"কলটা খারাপ। ঠিক মতো জল আসে না," ছবুলা উত্তর দিলো। "প্রায়ই টিউবওয়েল থেকে জল ধরে আনতে হয়। সব সময় আমি আনি না অবশ্যি। একটি ঠিকে ঝি রেখেছি। সেই এনে দেয়। তবে তুদিন ধরে সে আসছে না। কি জানি কী হয়েছে, অসুখ বিসুখ করলো না কি! তাই এ তুদিন আমিই আনছি।"

দীপক চুপ করে রইলো।

ছবুলা হেসে বললো, "এ পাড়ায় যে যার জল নিজেই ধরে। সুতরাং আমি আনি বা যেই আনুক কিছু আসে যায় না। ঠিকে ঝি রাখবার বিলাসিতা তো শুধু আমার আর ওদিকের ওই চক্রবর্তীদের। বেশীর ভাগ লোকের অবস্থা তো আরো খারাপ। আগে তো এ পাড়ায় মজুর দোকানদার ঠিকে ঝি শ্রেনীর লোকই থাকতো। ইদানিং কয়েকঘর আমাদের মতো লোক এসেছে। আর আমরা

তো এ পাড়ার এ্যারিস্টোক্র্যাট। সবই তো খোলার ঘর, শুধু তিনটে পাকা বাড়ি। এই তিনটে বাড়িতে জলের কল আছে, অন্য সবার তাও নেই। অবশ্যি পাকা বাড়ি হলেও, অন্যবাড়ির সঙ্গে তফাৎ বিশেষ কিছুই নেই। বাইরের দেওয়ালে নোনা ধরে গেছে, ভেতরটা অন্ধকার। কলে জল আসে না। আর অন্যান্য সব দুর্গতি তো আছেই। তবু, যাই হোক, টিকে তো আছে সবাই।"

জলের বালতি নিয়ে ছবুলা ভেতরে চলে গেল।

দীপক এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো।

একতলা বাড়ি। চারখানা ঘর। দুটোতে থাকে ছবুলারা, অন্য দুটোতে আরেকটি পূর্ববঙ্গীয় পরিবার। ছোটো ছোটো জানলা, ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা নেই, এ ঘরটায় কিছু আলো আসে, অন্যটা প্রায় অন্ধকার।

ছবুলা ফিরে আসতে দীপক বললো, "বাড়ির খোঁজ টোজ করছো ?"

"কেন এই তো বেশ আছি—।"

"সেকি ?" দীপক অবাক হোলো, "আমি তো ভেবেছিলাম ও বাড়ি থেকে তুলে দিতে আর কোথাও ঘর না পেয়ে উপস্থিত এখানে এসে উঠেছো, তারপর দেখে শুনে অন্য কোথাও উঠে যাবে। তুমি এখানেই স্থায়ী আস্তানা গাড়বে নাকি ?"

"কিছুদিনের মতো তো বটেই," ছবুলা হেসে বললো, "অন্তত যদ্দিন একটি ভালো কাজ না জুটছে। এ ঘর বেশ সস্তা, দীপক। দুখানা ঘর আর এক ফালি বারান্দা মাত্র পঁচিশ টাকা।"

"গোটা পোনেরো টাকা বেশী দিতে রাজী থাকো তো আমি তোমার জন্যে টালিগঞ্জ বা সাহাপুরের দিকে ঘর দেখতে পারি।"

"তাতে এর চেয়ে ভালো আর কী জুটবে দীপক। বড়ো জোর

একটি রাস্তা যার একটি নাম আছে, আর আশে পাশে সব ভদ্রলোকের বাস, দুএকজন বড়োলোকও হতে পারে। প্রথম যখন এসেছিলাম, ভেবেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই আবার উঠে যাবো। এখন দেখছি, জায়গাটা খারাপ নয়। আশেপাশের সবাই খুব ভালোবাসে আমায়। জায়গাটা একটু নোংরা, বর্ষায় কাদা হয়, কিন্তু লোকগুলো ভালো। ওই অশ্বত্থ গাছের নীচে সন্ধ্যেবেলা হিন্দুস্থানীরা বসে ঢোল বাজিয়ে গান গায়। কিন্তু আমি যদি সেতার বাজাই বা তানপুরোটা নিয়ে গান ধরি তো চুপ করে শোনে।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, "সব চেয়ে বড়ো কথা কি জানো? বাড়ি ভাড়া পঁচিশ টাকার বেশী নয়। আমি জানি যে এ পঁচিশ টাকা আমি দিয়ে যেতে পারবো, কারণ ভবানীপুরের গানের স্কুলের মাষ্টারিটা আমি যদ্দিন না ছাড়ি তদ্দিন থাকবে। ওরা দেয় চল্লিশ, বাড়ি ভাড়া দিয়ে পোনেরো টাকা থাকে। তারপর মাসে একটি করে প্রোগ্রাম রেডিওতে, আর সম্প্রতি একটি গানের টিউশানী পেয়েছি,—এ টাকায় আমাদের তিনজনের চলে যায়। নিশ্চিত আয়টা তো বেশী নয়, সুতরাং বাড়ি ভাড়াটা বেশী হলে আমার চলে না। অনিশ্চিত আয়টা বাড়লে কমলে সংসারের অন্যান্য খরচা বাড়িয়ে কমিয়ে একটা গোঁজামিল দেওয়া যায়। বাড়ি ভাড়ার বেলায় তো সেটি চলে না। ভাইটি স্কুলে পড়ে। ওকে মানুষ করতে হবে তো।"

"তোমার বাবা কোথায়, বেরিয়েছেন বুঝি?" দীপক জিজ্ঞেস করলো।

একটু ম্লান হয়ে গেল ছবুলার মুখ।

বললো, "উনি তো বাড়িতে বড়ো একটা থাকেনই না। কিরকম যেন একটু উদ্‌ভ্রান্ত গোছের হয়ে গেছেন। সকালে উঠে বেরিয়ে

যান, খেতে ফেরেন, আবার বেরিয়ে যান, রাত্তিরে ফিরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়েন। ওঁকে নিয়ে কোথাও বাইরে যেতে পারলে হোতো। কিন্তু সে তো এখন সম্ভব নয়।"

ছবুলা তুকাপ চা করে নিয়ে এলো।

চায়ে চুমুক দিয়ে দীপক জিজ্ঞেস্ করলো, "আচ্ছা, তুমি তো ইতিমধ্যে একবার হলেও আমাদের ওখানে বেড়িয়ে আসতে পারতে।"

"সময় পাইনি দীপক," ছবুলা বললো, "নতুন গেরস্তালি গুছিয়ে নিতে নিতে আর সময় করে উঠতে পারি নি। সকালে বাজারে গিয়ে কিছু না কিছু নিয়ে আসতে হয়, রান্নাবান্না করতে হয়, তুপুরে গানের টিউশানী। রাত্তিরে আবার রান্না। এসব আগেও ছিলো। তবু বাইরের কেনা কেটা যা করবার বাবা করতেন, একটি বাঁধা ঝি ছিলো, অসুস্থ হলেও সব কিছুর উপর নজর রাখবার জন্যে মা তো ছিলেনই, আমায় আর বাড়ি আগলে বসে থাকতে হোতো না। তবে সব একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি, তারপর আবার আগের মতো হৈ চৈ করা যাবে। আমরা তিনজন তো লোক, কীই বা অতো কাজ।"

দীপক চুপচাপ সব শুনলো।

তারপর বললো, "ছবুলা, একটা কথা খুব ভাবছি কিছুদিন ধরে।"

"কী?"

"থিয়েটার করবার নেশায় থিয়েটার করা, শো করা অনেক হোলো। ভাবছি, এবার একটু অন্য রকম ভাবে করতে হবে সব কিছু।"

"কী রকম?"

"ভাবছি, টাকা নিয়ে নাটক অভিনয় করবো।"

"পেশাদারী হয়ে যাবে নাকি ?" ছবুলা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"ঠিক পুরো পেশাদারী নয়," দীপক আস্তে আস্তে বললো, "আধা-পেশাদারী বলতে পারো। দেখ, আমরা যে নাটক অভিনয়ে বা গানে একটা কিছু নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করবো ভাবছি, অন্য কিছু করে শুধু শখের উপর সেটা হবে না। আমি যে চাকরিটা করছি, সেটা ছেড়ে দেবো স্থির করেছি। কারণ ওরা আমায় মাদ্রাজে বদলি করতে চায়। আর তুমিও তো একরকম কিছুই করছো না। আমাদের চলতে হবে তো।"

"পেশাদারী থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে ?" জিজ্ঞেস করলো ছবুলা।

"ওদের সঙ্গে তো পাল্লা দিতে যাচ্ছি না। ওদেরটা একরকম, আমাদেরটা একরকম। আমরা অল্প টাকায় করবো এ পাড়ায়, সে পাড়ায়। আমাদের নাম আছে, সেটা খুব শক্ত হবে না। তারপর মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার কি ওরকম কোনো একটা নাম করা বোর্ডে যদি দু একটা শো দিয়ে লোকের চোখে পড়তে পারি, তা হলে হয় তো আরো অনেক দূর এগুনো যাবে। আর মনে হচ্ছে করতে পারবো, কারণ আমরা দেবো নতুন নাটক, নতুন অভিনয় ভঙ্গী, নতুন স্টেজ ক্রাফট্‌, নতুন ধরনের গান, পুরনো রাগ-সঙ্গীতের নতুন ভঙ্গী—।"

ছবুলা হাসলো।

বললো, "চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, দীপক।"

দীপক চায়ে আরেকটি চুমুক দিলো।

তারপর বললো, "আমি তো একা পেরে উঠবো না। তোমাকেও থাকতে হবে।"

"নিশ্চয়ই। আর কেউ থাকুক না থাকুক, তুমি, আমি, মীনা,

বিমল, আমরা তো নিশ্চয়ই থাকবো। তা ছাড়া সুবোধ আছে, মঞ্জুশ্রী আছে।"

দীপক চায়ে তৃতীয় চুমুক দিলো। তারপর আরেক চুমুকে সরবতের মতো সবটাই খেয়ে নিলো।

"জানো ছবুলা", কাপটা নামিয়ে রেখে দীপক বললো, "মীনা আর বিমল একটু কী রকম যেন হয়ে যাচ্ছে।"

ছবুলা একটু হেসে উত্তর দিলো, "ওদের ছেলেমানুষি এখনো যায় নি। তা নিয়ে অতো ভাববার কী আছে? যদ্দিন আমাদের মতো ঝড় ঝাপটার মুখোমুখি না হয়, তদ্দিন অমনিই থাক। তারপর নিজেরাই ঠিক হয়ে যাবে।"

দীপক খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ছবুলা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"অতো ভণিতা করছো কেন?" ছবুলা হেসে জিজ্ঞেস করলো, "বলো না।"

"তুমি বিয়ে করবে না?"

হঠাৎ যেন একটা কালো মেঘের ছায়া ভেসে গেল ছবুলার মুখের উপর দিয়ে। কিন্তু সেটা কেটে যেতেই মুখ আবার ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো আকাশের মতো।

হেসে বললে, "কি করে করি বলো? সুবিধেমতো ঘরজামাই পাওয়া যাচ্ছে কোথায়?"

"ঘরজামাই? ঘরজামাই কেন?"

"বাবাকে আর ভাইকে ছেড়ে তো থাকতে পারবো না।"

"ও", চুপ করে গেল দীপক।

তারপর উঠে পড়লো।

"চললে এরই মধ্যে ?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। দশটা নাগাদ একজনের আসবার কথা আছে।"

দরজার কাছে গিয়ে দীপক হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো।

"কী আশ্চর্য ! আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। সত্যি সত্যি যে জন্যে এসেছিলাম—।"

ছবুলা চোখ তুলে তাকালো।

"শোনো, আমার মেসোমশায়ের এক বন্ধু তাঁর মেয়েদের গান শেখাবার জন্যে চাইছিলেন একজন কাউকে। আমি তোমার কথা বলেছি। তিনি রাজী হয়েছেন। আর তিনি রাখছেন শুনে তাঁর একজন আত্মীয়ও তাঁদের বাড়ির জন্যে তোমায় চাইছেন। একটি রিচি রোডে, আরেকটি এন্টালিতে—"

"ওরে বাবা, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম", ছবুলা হেসে বললো, "নিশ্চয়ই উঠে সবার আগে আয়নায় আমার নিজের মুখ দেখেছিলাম।"

দীপক ছবুলার মুখের দিকে তাকালো।

কী রকম যেন একটা নরম চাউনি ফুটে উঠলো তার চোখে।

ছবুলা খেয়াল করলো না।

দীপক চুপচাপ বাড়ি চলে গেল।

হাওয়ায় তখন সবে মাত্র শীতের আমেজ লেগেছে। ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে সন্ধ্যের দিকে। ছটার মধ্যে অন্ধকার হয়ে আসে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের ওধারে একপাশে চুপচাপ বসে-ছিলো বিমল আর মীনা।

"কী ভাবছো," মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"ভাবছি ছবুলার কথা," বিমল বললো, "দীপকের কাছে যা শুনলাম মনে হচ্ছে এখন ছবুলাদের খুব দুঃসময় যাচ্ছে।"

মীনা চুপ করে রইলো।

চীনেবাদামগুলোর খোসা ছাড়িয়ে মুখে পুরলো কয়েকটা।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আর কী ভাবছো, বিমল?"

"আর কী ভাববো বলো?"

"আমার কথা ভাবছো না?"

"তোমার কথা কী ভাববো," বিমল উত্তর দিলো, "দীপক আছে, আমি আছি, তোমার ভাবনা কী?"

"ভাবনার কথা ছাড়া আর কিছু ভাববার নেই? যা দীপক আর তুমি থাকলেও ভাবতে হয়?"

"কাকে ভাবতে হয়?"

"কাকে আবার? তোমাকে।"

বিমল হেসে ফেললো।

বললো, "বলো না কী ভাববো?"

"এমনি করে আর কদ্দিন চলবে?"

বিমল একটু বিষণ্ণ হোলো, "সত্যি, তুমি মন খারাপ করে দিলে

মীনা। সবে এম-এ পরীক্ষা শেষ হোলো, রেজাল্ট বেরুনোর আগে কিছুই ভাববো না ভেবেছিলাম। তুমি আবার ভাবিয়ে তুললে। চাকরি একটা যোগাড় করতে হবে। তাই না ?"

"নইলে কী করে চলবে ?"

"এদ্দিন তো বেশ চলেছে—।"

"তোমার একলার চলেছে। দুজন হলে তো চলবে না।"

"দুজন ?" অবাক হোলো বিমল। "দুজন আবার কোথায় ?"

"ন্যাকা !"

"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ," বিমলের বোধগম্য হোলো এবার।

তারপর হেসে ফেললো দুজনেই।

"অফিসে কলম পেশা আমার পোষাবে না," বিমল বললো, "ভাবছি একটা স্কুল মাষ্টারি যোগাড় করে নেবো।"

"না, না, স্কুল মাষ্টারিটা আমিই করবো। তুমি কোনো খবরের কাগজের অফিসে ঢুকবার চেষ্টা করো।"

"তারপর ?"

"তারপর কষে লেখো। গল্প লেখো, নাটক লেখো, উপন্যাস লেখো, কবিতা লেখো—।"

"আর তুমি ?"

"আমি নাচটা আরো ভালো করে শিখি।"

বিমল একটু চুপ করে রইলো। কী যেন তার মনে পড়লো। উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলো জলের ওপারে।

আস্তে আস্তে বললো, "গান লেখা বোধহয় বন্ধ হোলো।"

"কেন ?"

"গানে সুর দেবে কে ? ছবুলার সঙ্গে যোগাযোগ আস্তে আস্তে কমে আসছে।"

মীনা বিমলের দিকে একবার তাকালো। তারপর বললো, "ছবুলা ছাড়া আর কেউ নেই যে তোমার লেখা গানে সুর দিতে পারে?"

"ও রকম কেউ পারবে না।"

"কেউ না?"

"না।"

"আচ্ছা, বেশ। আমি নাচ শিখবো না। আমি গান শিখবো ভালো করে। দেখিয়ে দেবো আমি পারি কি পারি না।"

বিমল একটু ম্লান হাসি হাসলো।

"দীপক বলছিলো সব কিছু বদলে একটু অন্যরকম ভাবে দলটা গড়বে।"

"হ্যাঁ, দাদা টাকা নিয়ে নাটক অভিনয় করার কথা ভাবছে," মীনা বললো।

"সেটা হলে ভালোই হয়—।"

"কিন্তু দাদা কী করবে না করবে সে ভরসায় তো বসে থাকা যায় না।"

বিমল একটু অবাক হয়ে মীনার মুখের দিকে তাকালো।

"যদ্দিন আমি দাদার সঙ্গে আছি, কি তুমি একা আছো তদ্দিন এসব নিয়ে হৈ চৈ করা যায়," মীনা বলে চললো, "কিন্তু চিরকাল তো এমনি করে চলবে না।"

"তোমার মুখে একথা শুনে একটু অবাক হচ্ছি, মীনা।"

মীনা ম্লান হাসলো। বললো, "একলা হলে অনেক বড়ো বড়ো কথা ভাবা যায়, কিন্তু দুজন হলে সে হয় না।"

"কেন হয় না?"

"দুজন হলে দুজনকেই টিকে থাকবার কথাটা আগে ভাবতে হয়।'

"কিন্তু দুজনে মিলেও অনেক বড়ো কিছুর স্বপ্ন দেখা যায়, মীনা।"

"আমার যা কিছু স্বপ্ন, সে শুধু তোমাকে আর আমাকে নিয়ে। তার চেয়ে বড়ো আমার কাছে আর কিছু নেই।"

বিমল কোনো উত্তর দিলো না।

মীনা একটি চিনেবাদামের খোসা ছাড়িয়ে নিলো। নিজে খেলো না, তুলে দিলো বিমলের হাতে। বিমল সেগুলো মুখে পুরলো।

মীনা আরেকটি চিনেবাদামের খোসা ছাড়িয়ে বিমলের হাতে দিলো। বিমল চিনেবাদাম নিতে গিয়ে নিলো মীনার হাতটি। চিনেবাদাম গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল, মীনার হাতটি রয়ে গেল বিমলের হাতের মধ্যে।

"মীনা!"

"কী?"

"আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।"

"কী?"

"মনে হচ্ছে, এবার তোমায় সোজাসুজি আমার বাড়ি তুলে নিয়ে ফেলাই ভালো।"

মীনার মুখ একটু রাঙা হোলো, সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে বিমল দেখতে পেলো না।

"কি বলো?"

"তোমার যা খুশী—।"

"আমি তো বললাম।"

"কিন্তু তার আগে আমাদের নতুন সংসারটি চালানোর মতো ব্যবস্থা। একটা করে নিলে হোতো না?"

"সত্যি। কিন্তু কী করা যায় বলো তো?"

"পার্ক সার্কাসে একটি স্কুলে আমি একটি কাজ পাচ্ছি, জানো? ভাবছি সেটা নিয়ে নেবো।"

"তোমার ব্যবস্থাতো তুমি করলে, কিন্তু আমি?"

"শোনো, এক কাজ করো," মীনা বললো, "শুনেছি লরেন্স এ্যাণ্ড কানিংহ্যাম লোক নিচ্ছে ওদের টী-ডিপার্টমেণ্টে। সেখানে চেষ্টা করো।"

"করেছি," বিমল আস্তে আস্তে বললো।

মীনা চোখ তুলে তাকালো।

"হয়নি," বিমল উত্তর দিলো।

মীনা একটি হাত রাখলো বিমলের কাঁধে।

অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলো।

তারপর একটু হেসে আস্তে আস্তে বললো, "বিমল, আমি স্থির করে ফেলেছি। এসব সময় নেবে জানি। কিন্তু তার জন্যে আমাদের বসে থাকার কোনো মানে হয় না। বিয়েটা হয়ে যাক। যদ্দিন তোমার একটা কিছু না হয়, তদ্দিন আমি চালিয়ে নেবো। সে যদি তুমি না চাও তো, বিয়ের পরও কিছুদিন এমনি ভাবেই চলবে। তুমি তোমার মেসে থাকবে। আমি থাকবো দাদার সঙ্গে—।"

নিজের বিয়ের ঠিক হয়ে গেলে সবাই অন্যের বিয়ের জন্যেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিমলও হোলো।

বললো, "আইবুড়ো দাদার ঘর আর কদ্দিন আগলাবে? তোমাদের মা নেই, বাবা নেই, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে তো দীপক একলা হয়ে পড়বে।"

"কেন, গিরি পিসী আছে," মীনা বললো

দীপক আর মীনার অভিভাবক এক পিসী, তারই কথা বললো মীনা।

"না, না, ওসব পিসী-টিসী নয়, ওঁকে কাশী পাঠিয়ে দীপকের একটি বিয়ে দিয়ে দাও।"

হঠাৎ কেমন যেন একটুখানি গম্ভীর হয়ে গেল মীনা।

"কী হোলো," বিমল জিজ্ঞেস করলো।

"দাদা বোধ হয় কোনোদিনই বিয়ে করবে না," মীনা আস্তে আস্তে বললো।

কী রকম যেন হেঁয়ালি মনে হোলো বিমলের কাছে। কিন্তু এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

কথার মোড় ঘুরিয়ে বললো, "তাহলে মা-কে গিয়ে বলি—।"

"কী বলবে ?"

"ওঁরা একটা দিন ঠিক করুন। তারপর তোমায় আশীর্বাদ করতে আসুন। তারপর দীপক আমায় আশীর্বাদ করতে আসুক। না, না, তোমার গিরি পিসী না কে বললে ; —"

মীনা হেসে ফেললো।

বললো, "না বিমল, ওসব হবে না।"

"তাহলে ?"

"ইতিমধ্যে যে কোনো একদিন, আমি একটি সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরে, তুমি একটি মিলের ধুতি আর গেরুয়া পাঞ্জাবী পরে, সোজা গিয়ে হাজির হবো ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ওখানে।"

"কেন মীনা ?"

"শানাই বাজিয়ে, চেলি পরে, টোপর মাথায় দিয়ে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধু লোক জড়ো করে আমাদের বিয়ে হতে পারে না বিমল।

তাতে অনেক খরচা। দাদার অতো টাকা কোথায়? তারপর খরচা তো তোমাদের তরফেও হবে। আর তুমিও টাটা বিড়লা নও।"

বিমল একটু ভাবলো। তারপর একটু হেসে বললো, "বেশ, তাই হবে—।"

অন্ধকার আরো ঘনিয়ে আসতে দুজনে উঠে পড়লো। তারপর চৌরঙ্গির দিকে হেঁটে চললো দুজন দুজনের হাত ধরে।

দিন আট দশ পর, একদিন বিকেল বেলা দীপক যখন বারান্দায় ইজিচেয়ারের উপর চুপচাপ বসে সিগারেট ফুঁকছে বারান্দার রেলিং-এর উপর ঠ্যাং তুলে, নীচে বাড়ির সামনে একটি ট্যাক্সি থেকে নামলো মীনা আর বিমল।

বিমলের পরনে একটি মিলের ধুতি আর গেরুয়া পাঞ্জাবী।

মীনার শুধু একটি সাধারণ তাঁতের শাড়ি।

হাওয়ায় তখন সবে মাত্র শীতের আমেজ লেগেছে। পড়ন্ত রোদ্দুর ঠাণ্ডা হয়ে আসে চারটে বাজতে না বাজতেই।

মনোহরদাসেরই একটি কাজে টালিগঞ্জের এক স্টুডিওতে যেতে হয়েছিলো রঞ্জনকে। সে স্টুডিওতে কোন এক নতুন প্রযোজকের বই হচ্ছে, তারই ডিরেক্টরের সঙ্গেই দরকার। একটি টেক্-এর পর পরিচালক ভদ্রলোকটিকে একপাশে ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে কথাটা সেরে নিলো রঞ্জন।

আশেপাশের ভিড়ের মধ্যে অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠলো।

কী ব্যাপার?

মনোহরদাস কি বই করছে নাকি?

রঞ্জন যে মনোহরদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত সেকথা অনেকে জানতো। রঞ্জন হালে নৃত্যনাট্যের "ইম্প্রেসারিও," শৌখিন নাটকের "প্রযোজক" ইত্যাদি হয়েছে সেটা বিজ্ঞাপনের মারফত সবাই জানলেও, পেছনে মূলধনের যোগানদার যে মনোহরদাস সে কথাও কারো অজানা ছিলো না।

দুএকটি ছায়াচিত্র-মাসিকের সংবাদদাতা সেখানে উপস্থিত ছিলো। ওরা এসে পাকড়াও করলো রঞ্জনকে।

তাদের এড়িয়ে রঞ্জন চলে যাচ্ছিলো, পরিচালক বললো, আর দুটো শটের পর আজকের কাজ শেষ হবে। এ দুটো দেখে যাও।

এককোণে একটি ইজিচেয়ার এনে দিলো রঞ্জনের জন্যে। প্রোডাকশানের একজন এককাপ চা এনে দিলো।

"রঞ্জনদা, ভালো আছেন ?" মেয়েলী গলার সাড়া পাওয়া গেল এক পাশ থেকে।

রঞ্জন ফিরে তাকিয়ে দেখে সরমা, সেই মেয়েটি, যার জন্যে ছবুলা একদিন রাত্তিরে অমর চাটুজ্যের বাড়ি গিয়ে চড়াও হয়েছিলো।

"তুমি এখানে কী করছো ?"

সরমা একটি টুল টেনে রঞ্জনের কাছে বসলো।

"চৌধুরী সায়েব একটা চান্স দেবেন বলছিলেন। তাই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।"

বইটি যিনি পরিচালনা করছেন চৌধুরী সায়েব তাঁরই নাম।

রঞ্জন একটু অবাক হয়ে তাকালো সরমার দিকে।

"তুমি ফিল্মে নামতে চাইছো ?"

সরমা একটু হাসলো।

রঞ্জন সরমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলো।

সেই মেয়েটি ? অমর চাটুজ্যে যার হাত ধরেছিলো বলে ওর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলো, নালিশ করেছিলো ছবুলার কাছে। যাকে উপলক্ষ করে ছবুলার সঙ্গে এত গোলমাল, এত ভুল বোঝা ?

আর সেই মেয়ে স্টুডিওতে এসে ধরনা দিয়েছে বইতে একটা চান্সের জন্যে ! পরনে তার জমকালো রংদার শাড়ি, উদর-উন্মুক্ত আঁটসাঁট চোলি, হাতে হালফ্যাশানের ব্যাগ, মুখে উগ্র প্রসাধন।

রঞ্জনের মনটা একটু বিরূপ হোলো।

সরমা নিজের থেকেই বলে গেল, "এ বইতে একটি ছোটো রোল ছিলো। তাতে একজনকে নেওয়া হয়ে গেছে। উনি আরেকটি বইয়ের জন্যে কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা বলছেন। সেটা হলে আমায় চান্স দেবেন বলেছেন।"

রঞ্জন চুপ করে রইলো।

"আচ্ছা রঞ্জনদা, শুনছি মনোহরদাস একটা বই করছে। সবাই বলছে যে সে বই ডিরেক্ট করবেন চৌধুরী সায়েব। সে যদি হয়তো আপনার হাতেই সব। আমার জন্যে একটু বলে দেখুন না।"

রঞ্জন আস্তে আস্তে বললো, "মনোহরদাস নিজে কোনো বই করছেন না। করছেন ওঁর ফার্মের আরেকজন ডিরেক্টার। হয়তো মনোহরদাসের নিজের টাকা কিছু তার মধ্যে থাকবে।"

"আপনাকে এখানে দেখে সবাই কিন্তু বলছে—"

"আমি এসেছি অন্য ব্যাপারে। মনোহরদাস একটি নাটক নামাচ্ছেন কয়েকজন নামকরা ফিল্মস্টারদের নিয়ে। তিনি চান যে চৌধুরী সায়েবের মতো একজন নামকরা ফিল্ম ডিরেক্টার নাটকটির পরিচালনা করেন। তাহলে খুব ভালো বক্স-অফিস হয়। আমি এসেছি সেই ব্যাপারে।"

টেক্ শুরু হোলো।

আর কোনো কথাবার্তা হোলো না।

সেদিনকার কাজ শেষ হওয়ার পর চৌধুরী সায়েব এসে সরমাকে বললো, "আপনি আর কষ্ট করে এতদূর আসবেন না। সময় হলে আমরাই আপনাকে খবর দেবো।" তারপর বইটির নায়িকাকে ডেকে বললো, "আপনি মেক্-আপ তুলে তৈরী হয়ে আসুন, আমি অপেক্ষা করছি।" তারপর রঞ্জনের দিকে ফিরে বললো, "তাহলে মনোহরদাসজীকে বোলো আমি পরশু ওঁর অফিসে গিয়ে দেখা করবো'খন। গাড়িতে জায়গা নেই ভাই, তা নইলে তোমায় পৌঁছে দিতাম। মঞ্জরী দেবী আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।"

সরমার দিকে আর তাকালোই না। অন্যদিকে চলে গেল।

সরমা বললো, "এখান থেকে ট্রাম লাইন বেশ দূর। অনেকটা পথ হাঁটতে হয়।"

রঞ্জনের বলবার ইচ্ছে হোলো, "বেশতো হাঁটো না। হাঁটাহাঁটি করলে শরীরের গড়ন ভালো থাকে।"

কিন্তু বললো না। একটু মায়া হোলো মেয়েটির উপর।

সেজেগুজে এতটা পথ এসেছে। হয়তো অনেকক্ষণ খায়নি কিছু, কড়া মেক্-আপের নীচে মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে আছে।

বললো, "চলো। আমিতো ট্যাক্সিতে ফিরবো। পথে নামিয়ে দেবো'খন।"

ট্যাক্সিতে সরমা আর রঞ্জন কেউ বিশেষ কোনো কথাবার্তা বললো না।

বাড়ির কাছে এসে সরমা বললো, "রঞ্জনদা, আপনি কি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো না দিয়েই চলে যাবেন? একটু চা খেয়ে যান।"

রঞ্জন বললো, "আজ নয়। আরেকদিন আসবো।"

কিন্তু সরমা শুনলো না।

ওর পীড়াপীড়িতে নামতে হোলো রঞ্জনকে।

বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখলো একজন বয়স্ক মহিলা বসে জামা রিফু করছেন।

"আমার মা," বল্ল সরমা। "মা, ইনি রঞ্জনদা, আমাদের সেই শো-টা ইনিই করেছিলেন।"

রঞ্জন হাত তুলে নমস্কার করলো।

উনি ভেতরে চলে গেলেন।

সরমা বললো, "বসুন, চা করে নিয়ে আসছি।"

সে ভেতরে চলে যেতে রঞ্জন চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।

দুটো কামরার একটি ছোটো ফ্ল্যাট। দৈন্য আর অভাবের পরিচয় সব কিছুর মধ্যেই।

চা খেতে খেতে সরমাকে জিজ্ঞেস করলো, “ফিল্মে নামবার চেষ্টা করছো কেন? অন্য কোনো চাকরি বাকরি করো না, অনেক ভালো থাকবে।”

সরমা একটু চুপ করে থেকে বললো, “আমার টাকার দরকার রঞ্জনদা। ভালো চাকরি করবার মতো বিদ্যে নেই। এদিকে মস্তো বড়ো সংসার, মা, আর দুটো বোন, তিনটি ভাই। বছর চার আগে বাবা মারা যাওয়ার পর আমার মামাই আমাদের চালাতেন। ওঁর নিজের বলতে কেউ ছিলো না। উনি সম্প্রতি বুড়ো বয়েসে একটি বিয়ে করেছেন।”

রঞ্জনের একবার বলবার ইচ্ছে হোলো, “আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখি তোমার জন্যে কী করতে পারি।”

সরমাও বোধ হয় চায় যে রঞ্জন একথা বলুক। তা নইলে, এমন কিছু অন্তরঙ্গতা নেই তার সঙ্গে, সে কেন গায়ে পড়ে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়াবে, পারিবারিক ইতিহাস বর্ণনা করবে?

রঞ্জনের মুখ দিয়ে অভয়বানী বেরিয়ে পড়ছিলো। কেমন যেন তার মনে হচ্ছিলো সরমার মুখটি বেশ ঢলঢলে, মিষ্টি।

হঠাৎ খচ করে কাঁটা বেঁধার মতো মনে পড়লো যে এই সরমার জন্যে ছবুলা একদিন রাত্তিরে গিয়ে চড়াও হয়েছিলো অমর চাটুজ্যের বাড়ি। ছবুলার সঙ্গে যে মনোমালিন্য, ভুল বোঝা,—এই সরমাকে উপলক্ষ করেই।

অভয়বানী আর রঞ্জনের মুখ দিয়ে বেরুলো না।

ঢলঢলে, মিষ্টি মনে হোলো না সরমার মুখখানি।

“হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখ। অধ্যবসায় থাকলে একটা না একটা কোথাও লেগে যেতে পারে,” বলে রঞ্জন উঠে পড়লো।

মীনা আর বিমল তাদের কয়েকজন বন্ধুকে দীপকের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকেছিলো তাদের বিয়ের মাসখানেক পর।

সেদিন বাড়িতে কী একটা কাজে আটকে পড়ে ছবুলা আসতে পারলো না।

সে এলো দিন তিন চার পরে।

এসে দেখে বাড়িতে দীপক একা।

"মীনা কোথায় ?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"ওরা বেরিয়েছে। সেদিন তুমি এলে না কেন ? আমরা সবাই খুব হৈ হৈ করলাম।"

"বাড়িতে এমন কাজ পড়লো, আসতে পারলাম না। ওরা ফিরবে কখন ?"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই। বেরিয়েছে অনেকক্ষণ।"

বিকেল বেলা। ঠাণ্ডা পড়ছে আস্তে আস্তে। দীপক তার র‍্যাপারখানি ভালো করে জড়িয়ে নিলো।

নীল আকাশে একটুকরো মেঘ নেই কোথাও। এক সার পাখি উড়ে আসছে অনেক দূর থেকে।

ওদিকের বড়ো রাস্তায় একটি মিছিল চলে গেল স্লোগান দিতে দিতে।

এদিকটা নিরিবিলি। রাস্তা থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের।

দীপকের পিসী ভেতর থেকে চা করে পাঠিয়ে দিলেন।

চুপচাপ চা খেলো দুজনে।

তারপর ছবুলা জিজ্ঞেস করলো, "কী হোলো দীপক, কোনো কথাবার্তা বলছো না যে।"

দীপক তাকিয়ে ছিলো বাইরের দিকে।

মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বললো, "জানো ছবুলা, মনটা ভালো নেই।"

"কেন," ছবুলা একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো।

দীপক আস্তে আস্তে বললো, "জানো, মীনা ফিল্মে নামবার চেষ্টা করছে।"

"তাই নাকি! ভালোই তো।"

"বিয়ের আগে হলে আমি কিছুতেই রাজী হতাম না। কিন্তু এখন তো আমার বলবার কোনো অধিকার নেই—।"

"বিমল কী বলছে?"

"বিমলেরই তো বই।"

"সে কী। এতো বড়ো খবরটা তো আমায় দাওনি এতক্ষণ।" ছবুলা খুশী হয়ে উঠলো, "বিমলের বই যদি হয়তো নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে। আর তার বইতে মীনা নামবে এর চেয়ে ভালো কী হতে পারে।"

দীপক একটা ম্লান হাসি হাসলো।

বললো, "ছবুলা, ব্যাপারটা অতো খুশী হওয়ার মতো নয়।"

"কেন? বিমলের বই ফিল্ম হচ্ছে, এতে খুশী না হওয়ার কী আছে? কিন্তু বই সে লিখলোই বা কখন, সেটা ওদের গছালোই বা কী ভাবে?"

"বইটা বিমলের নিজের নয়—।"

"মানে?" ছবুলা বুঝতে পারলো না।

"ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। অসীম বোস নামে এক

ভদ্রলোক আছে, যুদ্ধের সময় ব্ল্যাকমার্কেটে অনেক পয়সা করেছে। ওর ভাই অমূল্য বিমলের সঙ্গে পড়তো। অসীম ভালো লিখতে পারে অথচ লেখক হিসেবে কোনো নাম নেই এরকম একজনের খোঁজ করছিলো। মতলব—একটি বই প্রডিউস্ করবে, তার গল্প চাই। অমূল্য বিমলকে নিয়ে গেল অসীম বোসের কাছে। বিমল খুব খুশী হয়ে নিজের একটি লেখা সঙ্গে করে নিয়েই গেল। অসীম বোস কিন্তু বিমলের লেখা পড়েও দেখলো না। বললো, ওসব গল্প আমি চাই না। জিজ্ঞেস করলো, এসটার উইলিয়ামের ছবি দেখেছো? ও রকম একটি গল্প চাই। গল্পের নায়িকা হবে খুব ভালো সাঁতারু, তার উপর ভালো নাচিয়ে, ভালো গাইয়ে। প্লটটা আমি দিচ্ছি, তুমি শুধু ওটাকে বাড়িয়ে, তাতে নানারকম ঘটনা জুড়ে, সংলাপ লাগিয়ে সেটাকে দাঁড় করাও। এই বলে বিমলকে একটা প্লট শোনালো। প্লট আর কিছু নয়—একটি মেয়ে খুব নাম করা সাঁতারু, তার উপর ভালো গান গায়, ভালো নাচে। কলেজের ছেলেরা সবাই তার জন্যে পাগল। একদিন স্যুইমিং পুল-এ একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হোলো, সেও খুব নাম করা সাঁতারু আর খুব ভালো গান গায়। প্রথম শট্—একটি মেয়ে সাঁতার কাটছে, নানারকম ভঙ্গীতে। পুলের চারদিকে অন্যান্য ছেলেরা আর মেয়েরা গান গাইছে।"

ছবুলা হাসতে শুরু করলো।

"হেসো না, শোনো। কিছুদিনের মধ্যেই ছেলেটির আর মেয়েটির মধ্যে গভীর প্রেম জমে উঠলো। তারপর একদিন একটি ছেলে যে সাঁতার জানে না, পা হড়কে জলে পড়ে গেল। মেয়েটি তাকে বাঁচালো। ছেলেটির বাপের অনেক টাকা। ওর মা বাপ উঠে পড়ে লাগলো মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে। ছেলেটি

প্রায়ই এর বাড়ি আসে, ওর মা বাপ গাড়ি পাঠিয়ে একে ওদের বাড়ি নিয়ে যায়। ওদের পার্টিতে মেয়েটি গান গায়, নাচে। এই নিয়ে আগের ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির ভুল বোঝাবুঝি, মনোমালিন্য। তারপর ঘটনার নানারকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মেয়েটির আর ছেলেটির মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেল, ভুল বোঝা মুছে গেল, ওদের বিয়ে হোলো। বিয়ের প্রীতিভোজ হোলো সেই সুইমিং ক্লাবে। লাস্ট শট—সুইমিং পুলে মেয়েটি আর ছেলেটি সাঁতার কাটছে। অন্যান্য ছেলেরা আর মেয়েরা সুইমিং কস্ট্যুম পড়ে সুইমিং পুলের চারদিকে পা ঝুলিয়ে বসে গান গাইছে। ফেড্ আউট্।"

শুনতে শুনতে ছবুলার হাসি আর থামতেই চায় না।

"বিমলকে অসীম বোস এই প্লটটি দিলো। বিমলের কাজ ওই সব যাকে বলে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত সেগুলো তৈরী করতে হবে। বিমল প্রথমটা রাজী হয়নি। টাকার অঙ্কটা অসীম বোস্ বেশ ভালোই বলেছিলো, কারণ সে এমন কোনো লেখক পাচ্ছিলো না যে এ গল্প লিখে দিতে রাজী হবে।"

"টাকা দিয়েও লেখক পাওয়া গেল না?"

"না। আরেকটি ফ্যাকড়া আছে যে। কাহিনীকার হিসেবে নাম থাকবে অসীম বোসের।"

"ও, তাহলে বিমল রাজী হবে কেন? আর এ রকম গল্পই বা সে লিখবে কেন?"

"কিন্তু রাজী হয়েছে শেষ পর্যন্ত।"

"তাও তো বটে। আশ্চর্য, কী করে হোলো?"

"বিমল প্রথমটা রাজী হয়নি। কিন্তু মীনাই ওকে বুঝিয়ে রাজী করালো।"

"মীনা? আমাদের মীনা?" ছবুলা অবাক। "সে কী করে হতে পারে?"

"বিয়ের পর মীনা অনেক বদলে গেছে ছবুলা। ও ভীষণ সাংসারিক হয়ে গেছে। সে বিমলকে বোঝালো, যে তাদের টাকা চাই। এখানে টাকা পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া গল্পটা বিমলের নামে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অসীম বোসের নামে। সুতরাং ক্ষতি কী! সব চেয়ে বড়ো কথা হোলো, এই যে একটা সুযোগ পাওয়া গেল, এর থেকে আরো অনেক বড়ো সুযোগ পরে আসতে পারে। তখন বিমলের ভালো ভালো লেখা সিনেমায় গছানো যাবে। সুতরাং এ সুযোগ অবহেলা করা উচিত হবে না।"

শুনে ছবুলা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললো, "সব সমস্যা ওই একই জায়গায় এসে ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে—টাকা চাই।"

দীপক একটু হাসলো।

বললো, "তারপরের ব্যাপার শোনো। বিমল তো টাকা এ্যাডভান্স নিয়ে বই তৈরী করতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে অসীম বোস দেখে আরেক ফ্যাসাদ। নায়িকার ভূমিকায় নামবার মতো মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। নাম করা স্টার যারা আছে ওরা নাচতে জানে তো গাইতে জানে না, গাইতে পারে তো সাঁতার জানে না, সাঁতার জানে তো নাচতে জানে না। গানের প্লে-ব্যাক হয়, নাচের বা সাঁতারের বেলায় সেটা চলে না। প্রডিউসার স্থির করলো যে নাম করা স্টার নয়, সে নতুন মেয়ে নামাবে। নতুন মেয়ের অনুসন্ধান শুরু হোলো। সেখানেও সেই একই সমস্যা, নাচতে জানে তো সাঁতার জানে না, সাঁতার জানে তো নাচতে জানে না। সাঁতার আর নাচ দুই জানে তো সুইমিং কস্ট্যুম

পরতে রাজী নয়, সুইমিং কস্ট্যুম পরতে রাজী তো ডিরেক্টার তাকে সুইমিং কস্ট্যুম পরাতে রাজী নয়।"

ছবুলা আবার হাসতে শুরু করলো।

"বিমল একদিন এসে মীনার কাছে সে গল্প করলো। মীনা অনেকক্ষণ ভেবে কী স্থির করলো কে জানে। বললো, অসীম বাবুকে গিয়ে বলো আমায় যদি একটা চান্স দিতে রাজী থাকেন, আমি তো সাঁতার, নাচ, গান, সবই জানি।

শুনে বিমলের চক্ষু স্থির। জিজ্ঞেস করলো, তুমি সুইমিং কস্ট্যুম পরবে?

মীনা জিজ্ঞেস করলো, কী রকম টাকা দিচ্ছে?

বিমল বললো, পোনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা। প্রো-রেটা দিন এক হাজার করে। পঁচিশ দিনের কাজতো নিশ্চয়ই আছে, বেশীও হতে পারে।

মীনা বললে, এ টাকা দিলে একটা বইতে সুইমিং কস্ট্যুম না হয় পরলামই বা। এ বইতে লোকের কাছে জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা প্রচুর। তারপর একবার নাম করতে পারলে, বোরখা পরে নামলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? তুমি একবার বলে দেখ।"

শুনতে শুনতে ছবুলার হাসি আবার মিলিয়ে গেল।

বললে, "এরকম ছবি সেন্সারে আটকাবে না?"

"ওরা কী আর ওসব না ভেবে এ কাজে এগুচ্ছে?" দীপক বললো। "যাই হোক বিমল তো ওদের গিয়ে বললো। ওরা শুনে খুব খুশী। মীনার নামও ওরা শুনেছে। দুএকটি শো-তে ওকে দেখেওছে। আজ বিমল মীনাকে নিয়ে গেছে ওদের ওখানে। পাকাপাকি কথাবার্তা সব আজই হবে।"

"তুমি মানা করলে না দীপক," ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"আমার অনুমতি তো সে চায়নি। আমায় শুধু এসে খবর দিলে, দাদা, আমি হয়তো ছবিতে নামছি। এত টাকা জন্মে দেখেনি। মাথা ঘুরে যাওয়া স্বাভাবিক—।"

ছবুলা আস্তে বললো, "মীনা! আমাদের মীনা! ভাবতেই পারি না।"

দীপক চুপ করে রইলো।

"বিমলই বা কী করে এ কাজ নিলো," ছবুলা বলে চললো, "না হয় কাহিনীকার হিসেবে নাম থাকবে আরেকজনের, না হয় পেলোই বা অনেক টাকা—কিন্তু তার প্রিন্সিপ্‌ল্‌-এ বাধলো না? এ কি একবার করে ছেড়ে দিতে পারবে? একবার, দুবার, তিনবার অন্যের হয়ে লিখে দেবে, তারপর একদিন ভাববে এতে লোকে তো কিছু মনে করে না, কেউ কিছু বলে না, আর বললেই বা ভারী বয়ে গেল, টাকা তো পাচ্ছি, তখন নিজের নামেই সে লিখতে শুরু করবে। মীনারও তাই হবে। সেও ভাববে, ছবির গল্প যা হবে হোক, অভিনয় করে যদি আমার নাম হয়, যদি টাকা পাই, কী আসে যায়। না, দীপক, তুমি যেমন করে হোক ওদের আটকাও। এ পথে গেলে ওরা নষ্ট হয়ে যাবে।"

"মানা করলে শুনবে না," দীপক বললো, "তুমি জানো না বিয়ের পর মীনা চট করে কি রকম বদলে গেছে। তার এখন একমাত্র ভাবনা, তাদের পারিবারিক জীবন যেন টাকার অভাবে অশান্তিময় না হয়ে ওঠে—। বিমল যে তার অনিশ্চিত আর্থিক ভবিষ্যতকে তুচ্ছ করে মীনাকে বিয়ে করেছে, এটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।"

"টাকা হলেই কি শান্তি আসে?"

"যতক্ষণ সে কথা নিজেরা না বুঝছে ততক্ষণ তাদের একথা

বোঝানো যাবে না। হোক টাকা, তারপর যখন দেখবে ঘোলাটে জল আরো ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, তখন বুঝবে। এখন বোঝাতে গেলে ভাববে ওদের আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সম্ভাবনা আমরা সইতে পারছি না।"

ছবুলা আর কিছু বললো না।

দীপক আস্তে আস্তে বললো, "পিসী আমাদের কী করে যে মানুষ করেছে সে আমিই জানি। ছেলেবেলা মা মারা যাওয়ার পর বাবা চলে গেলেন সাউথ আফ্রিকা। তারপর সেখানে বিয়ে করে বসলেন। আমাদের কোনো খোঁজও নিলেন না, শুধু মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েই খালাস। ভাগ্যিস পিসী ছিলো। বাবা মারা গেলেন সাউথ আফ্রিকাতেই, তাঁকে আর চোখেও দেখলাম না। তবু এখানকার বাড়িটা আমাদের দিয়ে গেছেন বলে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু আছে। তা নইলে আজ কী অবস্থা হোতো জানি নে।"

একটু চুপ করে রইলো দীপক। তারপর বললো, "এসব কথা কাউকে কোনোদিন বলিনি, ছবুলা। আজ শুধু তোমাকেই বললাম।"

ছবুলা কোনো উত্তর দিলো না।

দীপক বলে গেল, "মীনার বিয়ের পর সব কি রকম যেন অন্য রকম হয়ে গেল। মীনাও আছে, বিমলও আছে, মীনা যে এখানকার পাট উঠিয়ে দূর দেশে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তাও নয়, সব আগেরই মতো, তবু যেন আগের মতো নয়। মনে হচ্ছে যেন মীনা অনেক দূরে সরে গেছে, অনেক দূর দেশ চলে যাওয়ার থেকেও এ যেন আরো অনেক বেশী দূর। জানো ছবুলা, এখন মনে হয় বড্ড একলা হয়ে পড়েছি, ঠিক তোমারই মতো।"

ছবুলা একটু ম্লান হাসি হাসলো, কিছু বললো না।

বিমল আর মীনা ফিরে এলো ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই।

মীনা ঘরে ঢুকলো একরকম লাফাতে লাফাতে।

"জানো দাদা, কনট্রাক্ট সই হয়ে গেছে," বলে একটি চেক নাড়লো দীপকের নাকের নীচে।

বিমলেরও খুব হাসি হাসি মুখ।

"সোমবার থেকে শূটিং।"

"আগামী রোববার ফিল্‌ম্‌ নিউস্‌-এ রাইট-আপ বেরুবে," বিমল বললো।

"আজ আমার একটি ছবি তুলে নিলো।"

"ওরা আমার ছবিও চেয়েছিলো। এ্যাক্‌ট্রেস্‌ ওয়াইফ অফ্‌ এ রাইটার হাসব্যাণ্ড্‌—এ নাকি অদ্ভুত ক্যাপশান হবে। গল্পটা তো আমার নামে যাচ্ছে না, তাই আমি রাজী হলাম না।"

"তবে আমি বলেছি এ্যাক্‌ট্রেস ওয়াইফ অফ্‌ এ ইয়াং ড্রামাটিস্ট —একথা লিখতে। তোমার তিনটে নাটক তো এ পর্যন্ত পাব্‌লিক স্টেজে হয়েছে।"

"তোমার সম্বন্ধে কী লিখবে জানো? দি কুইন্‌ অফ্‌ ক্যাল-কাটাস্‌ এ্যামেচার স্টেজ্‌ আর্টিস্টস্‌—"

"এ সুইমিং পুল নিম্‌ফ্‌—"

"হূ ডান্সেস্‌ লাইক্‌ এ ফেয়ারী, সিংস্‌ লাইক্‌ এ সাইরেন্‌, লাভ্‌স্‌ লাইক্‌ এ জুলিয়েট্‌—"

দুজনের হৈ হৈ আর থামতেই চায় না।

দীপক আর ছবুলা চুপচাপ শুনে গেল।

কেউ চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতেও পারছিলো না।

"শূটিং-এর প্রথম দিন আমরা সবাই একসঙ্গে যাবো, কেমন? দাদা, ছবুলা, বিমল, আমি— ।"

দীপক হাসলো।

ওরা আসবার সময় পার্ক স্ট্রীট থেকে কেক্-প্যাটিস্ ইত্যাদি কিনে এনেছিলো। মীনা গিয়ে তাড়াতাড়ি চা করে নিয়ে এলো।

বিমল বললো, "দীপক। একটা কথা ভাবছিলাম। আমার সঙ্গে তো ওদের খুব জমে গেছে। এসো আমরা দল বেঁধে ঢুকে পড়ি। ওরা একজন ভালো অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার খুঁজছিলো, যে ভালো অভিনয় শেখাতে পারবে। বলো তো তোমার কথা ওদের কাছে পাড়ি। মীনা আর আমি বললে এক্ষুনি হয়ে যাবে। আর একজন প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট দরকার। ছবুলাকে ওরা সবাই নামে জানে। বললে সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে।"

দীপক ঘাড় নাড়লো।

ছবুলাও।

"কেন?" বিমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। "বলতে গেলে তো আমরাই সব। ও, আরো একটা কথা তোমায় বলিনি! আমি ডিরেক্টারের একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসেবেও কাজ করবো। আর কিছু নয়, কাজটা একটু শিখে নেওয়া। ওটা খুব দরকার। না, না, দীপক, ওসব প্রেজুডিসের কোনো মানে হয় না—, আমি কালই গিয়ে তোমার কথা ওদের বলছি।"

"ও লাইন আমার ভালো লাগে না," দীপক বললো। "আমার নেশা থিয়েটার। আমি থিয়েটার নিয়েই থাকবো।"

"এতে টাকা কোথায়?"

"টাকার কথা ভেবে তো আমি করছি না বিমল। তাহলে এসব না করে আমি মুদীর দোকান করতাম।"

"বেশ, তোমার যা ইচ্ছে। তাহলে আমি শুধু ছবুলার কথাই বলবো।"

"না, আমার কথাও বলতে হবে না," ছবুলা বললো।

"কেন", বিমল অবাক হয়ে বললো, "তোমার তো শুধু গান গাওয়া।"

"গান গাওয়ার মধ্যেও অনেক তফাত আছে বিমল। আমি যে গান গাই, সে গান ছবিতে চলবে না। ওরা আমায় দিয়ে যে গান গাওয়াতে চাইবে, আমি সে গান গাইবো না।"

"কী সব ছেলেমানুষের মতো কথা যে বলো," বিমল বললো, "প্লে-ব্যাক করে কতো লোক টাকা করছে, আর তোমার মতো একজন শিল্পী পড়ে থাকবে একটি বস্তির ভেতর—!"

"আমি অনেক কষ্ট করে গান শিখেছি. বিমল, তবে প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট হওয়ার জন্যে গান শিখিনি।"

"শোনো ছবুলা, এসব নাক-উচু কথা বলে কী লাভ। মানলাম তুমি খুব ভালো গান শিখেছো, আগে তুএকবার কনফারেন্সে গাইতে, যখন তোমার বয়েস ছিলো কম। কিন্তু গত তুবছরের মধ্যে কে তোমায় কোন কন্‌ফারেন্সে ডেকেছে? বড়ো জোর মাসে একটি রেডিওর প্রোগ্রাম,—সে তো সবাই পায়। ফিল্ম লাইনটাই হোলো আজকের দিনে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হবার একমাত্র মাধ্যম, সে সাহিত্যিকেরই হোক, গাইয়েরই হোক বা অভিনেতারই হোক। ফিল্মে গান গেয়ে তোমার নাম হলে তোমায় বম্বে থেকে ডাকবে. মাদ্রাজ থেকে ডাকবে, দিল্লী থেকে ডাকবে, দেশে যতো বড়ো বড়ো কনফারেন্স হবে সব কিছুতে ডাকবে, আর কতো টাকা পাবে তুমি। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হবে। গানের রেকর্ডিং হবে, তার রয়্যালটি পাবে! এমনি

কে পুছবে তোমায়? গত তিন বছরে তো তোমার গানের একটি রেকর্ডও হয়নি। এসব না করলে সারাজীবন ওই বস্তিতেই তোমায় কাটাতে হবে, শুধু টিউশানী করে খেতে হবে। পাবলিসিটি করতে না জানলে শুধু প্রতিভার কী দাম! এক কানাকড়িও না।"

ছবুলা হাসলো, বললো, "এসব প্রত্যেকটা কথারই উত্তর আছে। তবে অনর্থক কথা না বাড়িয়ে তোমায় আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে তোমার মুখে এধরনের কথা শুনবো আমি আশা করি নি।"

বিমল কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ছবুলার দিকে।

তারপর একবার মীনার দিকে তাকালো।

বললো, "একটা খবর এখনো দেওয়া হয়নি তোমাদের—।"

"আজ কী হোলো বলো তো," দীপক হেসে বললো, "শুধু খবরই দিয়ে যাচ্ছো একটার পর একটা।"

"এ খবরটা আরো চমক দেওয়ার মতো," বিমল বললো।

"বেশ তো, বলো শুনি।"

"খবরটা তোমার জন্যে নয় দীপক, ছবুলার জন্যে। তবে তোমরাও শুনে খুশী হবে," বলে ছবুলার দিকে ফিরে বিমল বললো, "এ বইটির নায়কের ভূমিকায় যে নামছে, তার নাম কী জানো?"

ছবুলা তাকালোই না বিমলের দিকে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"তার নাম রঞ্জন গুহ।...আমাদের রঞ্জন।"

মীনা তাকিয়ে দেখলো ছবুলার দিকে।

দেখলো কোনো ভাবান্তর নেই ছবুলার মুখে। সে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই, দীপকের নয়, বিমলের নয়, মীনার নয়।

দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলে দুলে চললো। একটি বেড়াল বারান্দার ওদিক থেকে এসে ঘরটা পেরিয়ে ভেতর দিকে চলে গেল। দুটো চড়ুই পাখি উড়ে বেরিয়ে গেল ঘুলঘুলি থেকে। একটি বোলতা ঘরের ভেতর ঢুকে এদিক ওদিক পর্যবেক্ষণ করে আবার বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

বিমল বললো, "এ বইতে আঠারোটা গান আছে। দশটা আমার লেখা, আটটা রঞ্জনের।"

দীপক আস্তে আস্তে বললো, "বিমল, তোমায় ছোটলোক বলতে চাই না, কারণ তোমার মন যে অতো ছোটো নয় তা আমি জানি। শুধু এটুকু বলবো যে তুমি আজ আমাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করলে।"

মীনা মুখ কালো করে সেখান থেকে উঠে গেল।

একটু পরে বিমলও চলে গেল সেখান থেকে।

পাশের ঘরে গিয়ে মীনা বললো, "বিমল, দাদার ওকথা বলা উচিত হয়নি। তবে তুমি ছবুলাকে ওভাবে আঘাত না করলেই পারতে। ওর সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা এখনো গেল না।"

"আমার দুর্বলতা! ছবুলার সম্বন্ধে? কী বলছো তুমি?" বিমল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"মুখ ফুটে তুমি কোনোদিন কাউকে বলো নি। কিন্তু আমি কি বুঝি না? ছবুলা তোমায় তৈরী করলো, তোমায় নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ করলো, অথচ ভালোবাসলো রঞ্জনকে, এ রাগ তোমার গেল না। তুমি যদি ছবুলাকে ওভাবে আঘাত করো,

তাহলে আমাকেই সব চাইতে বেশী দুঃখ দেবে, এ কথা মনে রেখো।”

বিমল গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলো।

বিমল আর মীনা বেরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরও ছবুলা আর দীপক কোনো কথা বললো না।

বেশ কিছুক্ষণ পর যখন আকাশে ফুটে উঠলো চারটা পাঁচটা তারা, দীপক বললো, “আমাদের দুঃখ করবার কিছু নেই ছবুলা। একজন একজন করে সবাই গেছে—কিন্তু—কিন্তু, ছবুলা, তুমি আছো—আমি আছি!”

তখনো ছবুলা কোনো কথা বললো না।

শুধু শীতের সন্ধ্যার মতো একটি ম্লান হাসি হাসলো।

তারপর উঠে পড়লো।

হাজরার মোড়ে এসে ছবুলা ট্রাম থেকে নামলো।

নেমে দেখে অন্যদিক থেকে হেঁটে আসছে সেই মেয়েটি, সরমা—যার জন্যে সে একদিন চড়াও হয়েছিলো অমর চাটুজ্যের বাড়ি।

একটু অবাক হোলো সরমাকে দেখে। আগে খুব সাদাসিধে ছিলো মেয়েটি, এখন জমকালো জামা কাপড়, চোলির উপরটা যতো নেমে এসেছে, নিচেরটা উপরে উঠেছে ততোখানি। এনামেল করা মুখ।

সে মুখের দিকে ছবুলা ভালো করে তাকিয়ে দেখলো।

দেখলো মুখটি ম্লান, বিষণ্ণ।

ছবুলাকে দেখে সরমা কাছে এলো।

তুচারটি মামুলী কথার পর ছবুলা জিজ্ঞেস করলো, "কী করছো আজকাল ?"

"কিছুই না", উত্তর দিলো মেয়েটি। তারপর বললো, "ছবিতে নামবার চেষ্টা করছি। এখন পর্যন্ত কিছু হয়ে ওঠে নি।"

"এখন আসছো কোত্থেকে ?"

"এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছিলাম। তিনি একটি বই প্রডিউস করছেন। রঞ্জনদা নিয়ে গিয়েছিলো।"

"কে ?"

"রঞ্জনদা !"

ছবুলা চুপ করে রইলো। ভাবলো, এই মেয়েটিকে উপলক্ষ করেই একদিন ঝগড়া হয়েছিলো অমর চাটুজ্যে, রঞ্জন, এদের সঙ্গে !

"দিন তুই আগে তাদের সঙ্গে স্টুডিওতে গিয়েছিলাম," সরমা বলে যেতে লাগলো, "ওরা এক সাঁতারু মেয়ের উপর কি একটা বই করছে। টু-পীস কস্ট্যুম পরিয়ে কয়েকটি শট্ নিলো। হয়তো হয়ে যেতো। ডিরেক্টার বলছিলেন, আমায় দিয়ে চলবে। আজ গিয়ে শুনলাম, আরেকজন কাকে নাকি নেওয়া হয়ে গেছে। কারণ আমায় দিয়ে চলবে না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম, আমায় দিয়ে কেন চলবে না। ওরা বললে, আমার সরমা নামটি নাকি ফিল্‌ম্ লাইনে অচল। আমি বললাম, অন্য কোনো ছদ্মনাম নিয়ে নেবো। এ কথার উত্তর ওরা কেউ দিলো না। একজন শুধু বললে শরম মানে তো লজ্জা। যার নাম শরমা, তাকে টু-পীস কস্ট্যুম পরিয়ে কী করে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করানো যায় ! শুনে সব্বাই হেসে উঠলো।"

ছবুলা আস্তে আস্তে বললো, "তোমার নাম তো শরমা নয়, তোমার নাম সরমা। বিভীষণের বৌয়ের ছিলো ওই নাম।"

"ওদের ওসব বলে কী লাভ," সরমা উত্তর দিলো, "আমি উঠে চলে এলাম। কারণ, ওরা তখন নির্লজ্জের মতো হাসছে।"

একটু চুপ করে থেকে সরমা বললো, "শুধু একজন হাসে নি। সে রঞ্জনদা। সে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলো। রঞ্জনদার মতো লোক হয় না।"

ছবুলা সরমার দিকে তাকালো।

হাসলো একটুখানি।

কেটে গেল অনেকদিন।

বিয়ের পর মীনা আর বিমল একটি ফ্ল্যাট নিয়েছিলো গরচায়। আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সঙ্গে সঙ্গে সেটি ছেড়ে দিয়ে হিন্দুস্থান পার্কে উঠে এলো।

ওদের সঙ্গে ছবুলার দেখা হোতো না বড় একটা। দীপক আসতো প্রায়ই। ওদের খবর পেতো ওরই কাছে। আরো খবর পেতো সিনেমা মাসিকের পাতায়, বিভিন্ন দৈনিকের শুক্রবারের সিনেমার পাতায়—মীনা সাহা নতুন কী বই করছে, কবে বম্বে যাচ্ছে, সম্প্রতি কোন পার্টিতে গিয়েছিলো, কী শাড়ি ওর পছন্দ, ওর নতুন পোষা কুকুরটা কী ভালোবাসে, কোন সাহিত্যিকের বই মীনার পছন্দ, ইত্যাদি। বিমলেরও নাম হতে আরম্ভ করেছে সম্প্রতি, চিত্রনাট্যকার হিসেবে। ইতিমধ্যেই তিনটে গল্প সে বেচেছে, একটা মুক্তিলাভ করেছে বিভিন্ন হাউসে, তিন হপ্তা ফুল-হাউস্ রান্ দিয়েছে। আর দুটো ফ্লোর্-এ গেছে।

আর নাম হয়েছে রঞ্জনের, অভিনয় আর গানের জন্যে। একটা বিশেষত্ব তার, যে গানগুলো গায়, সবই নিজের লেখা, নিজের সুর দেওয়া। একটা ঢং আছে তার গানের, যেটা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

আর নাম হয়েছে মীনা সাহা আর রঞ্জন দুজনেরই, যুগল নায়ক-নায়িকা হিসেবে। যে বইতে মীনা সাহা নায়িকা, সে বইতে রঞ্জনকে ছাড়া আর কাউকে নায়ক হিসেবে ভাবতে পারে না দর্শক সাধারণ। রঞ্জন নায়ক হলেই যেন মীনা সাহার অভিনয় আরো

ভালো খোলে। অন্য কোনো স্টার যেন তাল রেখে চলতে পারে না মীনা বা রঞ্জনের সঙ্গে। ওরা দুজন হলেই নাচে, গানে, রোমান্টিক সংলাপে দর্শকচিত্ত থৈ থৈ করতে থাকে বান-জাগা যমুনার মতো, আর হপ্তার পর হপ্তা হাউস ফুল টাঙানো থাকে সিনেমা হলের দরজায়।

দীপকের সঙ্গে রঞ্জনের একদিন দেখা হয়ে গেল পার্ক স্ট্রীটে।

রঞ্জন তাকে নিজের গাড়িতে তুলে টেনে নিয়ে গেল এক বিখ্যাত রেস্তরাঁয়।

চা আর স্যাণ্ডুইচের অর্ডার দিয়ে বললো, "অনেকদিন তোমাদের কারো কোনো খবর পাই না। নতুন কোনো বই নামিয়েছো বলে তো শুনি নি। কী করছো আজকাল ?"

"বই নামানোর অনেক খরচা," দীপক উত্তর দিলো, "নিউ এম্পায়ারে একটি নতুন নাটক করবার ইচ্ছে আছে! তবে পেরে উঠছি না। আর এখন একটু ব্যস্ত আছি অন্য ব্যাপারে—নাটক সংক্রান্তই, তবে বই নামানো নয়।"

রঞ্জন জানতে চাইলো।

"নাটকের ধারাটা পাল্টে দিতে হবে রঞ্জন," দীপক বললো, "তবে সেটা কারো একলার প্রচেষ্টায় সম্ভবপর নয়। আর এই পরিবর্তন পেশাদারী থিয়েটারকে দিয়ে হবে না। পেশাদার থিয়েটার বাংলা নাটকে কোনো নতুন ধারা কোনোদিনই আনতে পারে নি। যারা এনেছে, ওরা শখের জন্যে নাটক করতে গিয়ে নতুন কোনো ধারার উদ্ভাবন করেছে, পরে নিজেরা পেশাদার হয়ে গিয়ে সেটা গ্রহণ করিয়েছে পেশাদার থিয়েটারকে। তাই আমার ধারণা, এখন যে পরিবর্তন আসবে সেটাও আসবে শৌখিন দলগুলোর

মধ্যে থেকে। তাই একদিন মনে হোলো, কারো একলার প্রচেষ্টায় এটা যখন সম্ভব নয়, তখন বাঙলা দেশের সমস্ত শৌখিন দলগুলো যদি একটি সংস্থার মধ্যে সম্মিলিত হয়, ফরমাশ দিয়ে নতুন নাটক লেখায়, নতুন টেকনিক, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, আর কোনো নতুন প্রয়োজনাভঙ্গী নিয়ে সেগুলো মঞ্চস্থ করে, তাহলে সেগুলো দেখতে দেখতে লোকের রুচি পাল্টে যাবে, আর দর্শকদের রুচি বদলে গেলে, পেশাদার থিয়েটারও সেই নতুন ধারাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।"

রঞ্জন একটু হাসলো।

সেটি লক্ষ্য করলো না দীপক। বলে গেল, "দুর্গা পূজোয়, সরস্বতী পূজোয়, নববর্ষে, আর নানারকম ছুটি ছাটায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বছরে হাজার হাজার অভিনয় হয় বাংলা দেশে, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, বছরে একটিও ভালো নতুন নাটক লেখা হয় না। ঘুরে ফিরে সেই বংগেবর্গী, মিশর কুমারী, আত্মদর্শন, চন্দ্রগুপ্ত, শাজাহান, কারাগার আর আলমগীর। অভিনয় কেউ করতে চায় না, সবাই শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু এদের প্রতিবিম্ব হতে চায়।"

"কাউকে মডেল না ধরলে, অভিনয়ে উন্নতি করবে কী করে?"

সে কথার উত্তর দিলো না দীপক।

বলে গেল, "আজ কয়েক মাস ধরে কলকাতার বিভিন্ন শৌখিন দলের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছি। যদি একটা সংস্থা তৈরী করতে পারি, যেখানে ছোটো হল থাকবে, নতুন নতুন নাটক এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে, প্রায়ই মিলিত হয়ে আলোচনা করা যাবে নাটক লেখা আর অভিনয় সম্বন্ধে, নতুন নাটক অভিনয় করতে বিভিন্ন শৌখিন দলকে উৎসাহ দেওয়া যাবে, নাট্য প্রতিযোগিতার

আয়োজন করা যাবে, নাটক লেখা, অভিনয় করা, নাটক প্রযোজনা করা, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় শেখানো যাবে—তা-হলে একটি মস্তো কাজ হয়। আরেকটি কথা ভাবছি, সে একাঙ্ক নাটক। লক্ষ্য করেছো রঞ্জন,—একাঙ্ক নাটক লেখা বা অভিনয় করায় আমাদের এখানে কারো কোনো আগ্রহ নেই?"

রঞ্জনের মুখ দেখে মনে হোলো ওর আর এসব শুনতে ভালো লাগছে না।

তবু দীপক বলে গেল, "যা ভাবছি, এসবের খানিকটাও যদি করতে পারি তো অনেক কাজ হবে।"

"নিজের জন্যে কী করছো", রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

"নিজের জন্যে?" দীপক একটু অবাক হোলো, "কেন, এসব যদি হয় তাহলেই আমি খুশী। নিজের আবার কি?"

ঘাড় নাড়লো রঞ্জন।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কদ্দূর এগিয়েছো?"

দীপক এবার একটু বিষণ্ণ হোলো। বললো, "কিছুই করা যাচ্ছে না ভাই, অনেক টাকা দরকার। মুখে সবাই উৎসাহ প্রকাশ করে, কাজের বেলা পেছিয়ে যায়।"

রঞ্জন হাসলো। বললো, "তোমার এরকম প্রতিভা এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা আমার খুব খারাপ লাগছে দীপক। দেখ, তোমার মতো আমরা কেউই নই, অথচ আমাদের বেশ চলে যাচ্ছে—।"

দীপক হেসে বললো, "আমারও বেশ চলে যাচ্ছে, রঞ্জন।"

রঞ্জন একটু চুপ করে রইলো। ফাইভ্ ফিফ্টী ফাইভের টিন খুলে একটি সিগারেট ধরালো।

তারপর দীপকের দিকে এগিয়ে দিলো সিগারেটের টিন।

দীপক বললো, "না, আমার নিজের একটি ব্র্যাণ্ড আছে। সেটি

ছাড়া অন্য কিছু আমার চলে না," বলে পকেট থেকে একটি পাঁচ আনা দামের প্যাকেট বার করলো।

"শোনো, দীপক," সিগারেটর ধোঁয়া ছেড়ে রঞ্জন বললো, "মনোহরদাস একটি থিয়েটার হল লীজ নিচ্ছে। আমরা সবাই আছি তাতে। তুমি যদি আসতে চাও—।"

দীপক বললো, "সে হয় না রঞ্জন। তোমাদের সঙ্গে আমার বনবে না।"

রঞ্জন আর কিছু বললো না।

চা শেষ করে ওরা উঠে পড়লো।

সেদিন রোববার সকাল।

ভবানীপুরের গানের স্কুলে ক্লাস নিতে হবে ছবুলাকে।

ট্রামে চেপে যাচ্ছিলো। পাশের সীটে একটি মেয়ে। হাতে তার একখানি বহুলপ্রচারিত সিনেমা মাসিক। কভারে রঞ্জন আর মীনা সাহার ছবি। মাসিকের পাতায় তন্ময় হয়ে ডুবেছিল মেয়েটি।

একটি লাল আলোর সামনে ট্রামটি দাঁড়ালো। পাশে এসে দাঁড়ালো একটি লম্বা গাড়ি।

হঠাৎ সামনে, পেছনে, পাশে, সবাই ঝুঁকে পড়লো জানলা দিয়ে।

ছবুলা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। দেখলো মীনা বসে আছে গাড়ির ভেতর।

মীনা সাহা!—মিনা সাহা!—প্রত্যেকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো সেই নাম।

ট্রামের কনডাকটার টিকিট করতে ভুলে গেল।

বিনা টিকিটে যে যাচ্ছিলো সেও এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে

নেমে গেল না ট্রাম থেকে। কনডাকটারের ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মারলো মীনা সাহার গাড়ির দিকে।

ছবুলা মুখ ফিরিয়ে নিলো।

পাশের মেয়েটি হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে ছবুলা তাকাচ্ছে না।

বেচারী হয়তো জানেনা,—মেয়েটি বোধ হয় ভাবলো।

ছবুলার দিকে ফিরে চক্ষু বিস্ফারিত করে বললো, "মীনা সাহা !"

ছবুলা হাসলো। কিছু বললো না।

"ওই গাড়িতে !" বললো মেয়েটি।

"হ্যাঁ, দেখেছি।"

ছবুলার আগ্রহের অভাব মেয়েটিকে অবাক করলো।

ভাবলো, বোধ হয় বুঝতে পারে নি।

"সমুদ্রের রং নীল—বইটির নায়িকা মীনা সাহা," বললো সে।

"হ্যাঁ, জানি।"

"কী সুন্দর দেখতে ! কী মিষ্টি হাসি ! কী রকম মুক্তোর মতো দাঁত!"

ছবুলা হাসলো একটুখানি।

স্টপ্‌টা এসে পড়তেই নেমে গেল ট্রাম থেকে।

ট্রাম থেকে নেমে ফুটপাথে উঠতেই একটি গাড়ি এসে থামলো।

"ছবুলা।"—কে যেন ডাকলো।

ফিরে তাকিয়ে দেখে রঞ্জন ডাকছে পেছন থেকে।

কী করবে ভেবে স্থির করবার আগেই সে সামনে এসে দাঁড়ালো।

"কী খবর ছবুলা ! অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কী রকম আছো ?"

"ভালো। চলি, আমায় যেতে হবে এক জায়গায়। দেরি হয়ে গেছে," ছবুলা বললো।

"আমার সঙ্গে ছুমিনিট কথা বলবার সময়ও তোমার নেই ?"

"না।"

"বেশ, একদিন তোমার বাড়ি আসবো, কী বলো ?"

"এলে আমায় পাবে না। আমি খুব কমই বাড়িতে থাকি," ছবুলা উত্তর দিলো।

"রঞ্জন গুহ !"

ছবুলা মুখ ফিরিয়ে দেখে আশেপাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। তারা চিনতে পেরেছে রঞ্জনকে।

"আর দাঁড়াবো না, এবার যাই," বললো ছবুলা।

গানের স্কুলটা সামনেই। ছবুলা ফুটপাথ পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।

রঞ্জন ফিরে গেল তার গাড়িতে।

ঘরে ঢুকতেই ছাত্রীরা ছবুলাকে ছেঁকে ধরলো।

"ছবুলাদি, আপনি রঞ্জন গুহকে চেনেন ?"

"আমরা সবাই জানলা দিয়ে দেখলাম রঞ্জন গুহ আপনাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে ছুটে এলো।"

"আপনি কি এবার ফিল্মে নামবেন, ছবুলাদি ?"

"রঞ্জন গুহের কী সুন্দর নাক, কি রকম চাউনি। কী লম্বা, কী সুন্দর গলা।"

ছবুলা এসব কথার কোনো উত্তর দিলো না। গম্ভীর ভাবে ক্লাস শুরু করে দিলো।

মাদ্রাজ থেকে একজন ডিস্ট্রিবিউটার এসেছিলো কলকাতায়।

ছায়াচিত্র জগতের কয়েকজনকে সে কক্‌টেল্‌ পার্টিতে ডেকে ছিলো।

সেখানে অনেকের মধ্যে রঞ্জন আর মীনাও ছিলো।

তাদের এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে খানকয়েক ছবি তুলে নিলো বম্বের এক চিত্র-সাপ্তাহিকের প্রতিনিধি।

রঞ্জন মীনাকে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "বিমলকে দেখছি না কেন?"

মীনা উত্তর দিলো, "ও গেছে চন্দননগর। ওর কোন এক কাকার নাকি খুব অসুখ। তাই আসতে পারলো না।"

কিছুক্ষণ গল্প করবার পর রঞ্জন বললো, "তোমার হাতে তো কিছু নেই, এনে দিই একটা কিছু? কী আনবো?"

"অরেঞ্জ স্কোয়াশ, আর কিছু নয়।"

রঞ্জনের তখন সবে মাত্র পঞ্চম হুইস্কিটি শেষ হয়েছে।

"এ সব বুঝি মুখে রোচে না?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"না, অতো আধুনিকা এখনো হতে পারিনি," মীনা হেসে বললো।

রঞ্জন চলে গেল বার্‌-এর দিকে।

একজন বেয়ারার কাছ থেকে রঞ্জন নিজের জন্যে একটি হুইস্কি আর মীনার জন্যে একটি অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিলো।

ছায়াচিত্র জগতের অনেকেই ছিলো সেই পার্টিতে। তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গল্প করতে করতে রঞ্জন আর মীনা দুজন দুদিকে সরে গেল।

রঞ্জন তখন আস্তে আস্তে একটু অপ্রকৃতিস্থ হতে আরম্ভ করেছে।

একজন পরিচালক বললো, "রঞ্জন গুহ আজকাল বড্ড ড্রিঙ্ক্‌ করছেন। সত্যি এতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

মীনা পার্টি থেকে বেরিয়ে এলো কিছুক্ষণ পরেই।

দেখলো রঞ্জন তখনো চালিয়ে যাচ্ছে।

মীনা বাড়ি ফিরে এসে দেখলো বিমল বসে আছে।

জিজ্ঞেস করলো, "তুমি না বলছিলে আজ রাত্তিরে ফিরবে না। এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে?"

"ওখানে আর ভালো লাগলো না, তাই চলে এলাম," বিমল উত্তর দিলো। "তারপর, পার্টি কি রকম হোলো?"

"এ ধরনের পার্টি যে রকম হয়—," মীনা হেসে উত্তর দিলো, "অনেকেই এসেছিলো। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো সবাই।"

তারপর বললো, "জানো, পার্টিতে দেখলাম রঞ্জন বড্ড ড্রিঙ্ক করছে। ও নাকি আজকাল বড্ডো মদ খায়। কেন এ রকম হোলো বলো তো?"

"আজকাল কে খায় না?" বিমল জিজ্ঞেস করলো।

"সে কথা বোলো না। অনেকেই খায় না। তুমি খাও না। আমি খাই না। দাদা খায় না। আমি যাদের যাদের ভালো করে চিনি তারা কেউই খায় না। কিন্তু রঞ্জনটা এ রকম হোলো কেন?"

"সে আমি কি করে বলবো?" বিমল উত্তর দিলো।

"আমার মনে হয়," মীনা আস্তে আস্তে বললো, "রঞ্জন ছবুলাকে এখনো ভুলতে পারেনি। এখন ওকে ভুলবার জন্যেই মদ ধরেছে। আচ্ছা, ছবুলাই বা কি, রঞ্জনকে বিয়ে করে ফেললেই পারে—।"

"তুমি তো ভালো করেই জানো, মীনা, সে হয়না।"

মীনা তাকিয়ে দেখলো বিমলকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো,

"আচ্ছা, ছবুলার প্রসঙ্গ উঠলে তোমাদের মুখ এত বিষণ্ণ হয়ে যায় কেন বলো তো?"

বিমল একটু চুপ করে রইলো।

তারপর হেসে উত্তর দিলো, "ছবুলাকে তুমি, আমি, দীপক, আমরা সবাই খুব ভালোবাসি কিনা, তাই ওর মতো প্রতিভাবান মেয়ে যে এখনো এত কষ্টে আছে, এ কথা মনে পড়লেই মন খারাপ হয়ে যায়। আর এর জন্যে খানিকটা দায়ী তো রঞ্জন। আমরা সবাই বেশ ছিলাম। হঠাৎ রঞ্জন মাঝখানে এসে পড়ে সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দিলো।"

মীনা আর বিমল খেতে বসলো।

খাওয়ার মাঝখানে মীনা একসময় বললো, "ফিল্ম লাইনটা প্রথম প্রথম খুব ভালো লেগেছিলো। এখন বড্ড একঘেয়ে লাগছে। মনে হচ্ছে ছেড়ে দিতে পারলে বেঁচে যাই। একটু নিরিবিলি থাকবার উপায় নেই। থাকা, খাওয়া, চলা, ফেরা, মেলামেশা সব কিছু একটি জিনিসের উপর চোখ রেখে করতে হয়—সেটা বক্স-অফিস। মনে হয়, আগে বেশ ছিলাম। আমি, তুমি, দাদা, ছবুলা, সুবোধ বাবু সবাই মিলে বেশ হৈ হৈ করতাম।"

বিমল চুপ করে শুনলো।

তারপর বললো, "এখন আর ছেড়ে দেওয়া যায় না, মীনা। একবার যখন এর মধ্যে ভিড়েছি, তখন এর মধ্যেই থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত। এখন আর কিছু নতুন করে করা সম্ভব নয়। জীবনযাত্রার মান এত বেড়ে গেছে যে এটা কমানো অসম্ভব, আর এটা বজায় রাখতে হলে যে আয় দরকার সেটা আমরা আর কোনো কিছুর থেকেই পাবো না।"

"দাদার খবর জানো কিছু? দেখাই হয় নি কদ্দিন," মীনা বললো।

"ও নতুন কি একটা সংগঠন করবার চেষ্টা করছে সমস্ত অ্যামেচার ক্লাবদের নিয়ে।"

"ছবুলা?"

"ছবুলা গানের মাষ্টারি করে বেড়াচ্ছে, আর দীপকের সঙ্গেও কাজ করছে ওর সংগঠনের মধ্যে।"

রঞ্জন নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে পার্টি থেকে ফিরছিলো।

সুরেন ব্যানার্জি রোড পেরিয়ে দক্ষিণে যাওয়ার সময় দেখে বাস-স্টপে সরমা দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জন গাড়ি থামিয়ে তাকে তুলে নিলো। কিছুদূর গিয়ে বললো, "সরমা, তোমার কি বাড়ি ফেরার তাড়া আছে?"

"কেন?" সরমা জিজ্ঞেস করলো।

"মাথাটা বড্ডো ভার হয়ে আছে। আর বড্ডো গরম পড়েছে আজ। ভাবছি কিছুক্ষণ রেড রোডের ওদিকে ড্রাইভ্ করলে কি রকম হয়। যদি তোমার তাড়া না থাকে—।"

সরমা এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে যে রঞ্জন খুব প্রকৃতিস্থ নেই। কারণটাও ধরে ফেলেছে তার মুখের গন্ধে। আগে টের পেলে উঠতোই না।

বললো, "না, না, আমায় বাড়ি ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। আমায় বরং এখানে নামিয়ে দিন। আমি বাস ধরবো এখান থেকে।"

রঞ্জন একটু ভাবলো। তারপর বললো, "সরমা, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। তাই বলছিলাম।"

"আমার বাড়ি চলুন—।"

"না, বাড়িতে নয়।" সরমার কথা না শুনেই ডাইনে গাড়ি ঘুরিয়ে রেড রোডের দিকে চলে এলো রঞ্জন।

দু পাশে অন্ধকার ময়দান। অনেক দূরে দূরে আলোর সারি। তারই মধ্যে খানিকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের কাছাকাছি একটি ছোটো রাস্তার একপাশে একটি গাছের তলায় রঞ্জন গাড়িটা দাঁড় করালো।

তারপর বললো, "কি করছো আজকাল—?"

"কিচ্ছু না," সরমা উত্তর দিলো, "ছবুলাদি সেদিন জিজ্ঞেস করছিলো ওদের একটি নাটকে আমি নামবো কি না।"

"টাকা দেবে ?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

"তাতো জানি না।"

"ওসব পাগলামি ওদের মাথা থেকে এখনো গেল না," বললো রঞ্জন। "দেখ, ওসব আর করতে যেও না। ওসব করে কোনো সুখ নেই। আর আমার মতো সিনেমায় অভিনয় করে বেড়িয়েও কোনো সুখ নেই। টাকা, হ্যাঁ, টাকাটা পাচ্ছি,—কিন্তু আর কী পাচ্ছি, কিচ্ছু না। তুমি আর এসবের মধ্যে এসো না। চুপচাপ ভালোমানুষের মতো একটি বিয়ে করে ফেল।"

সরমা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর বললো, "সে হয় না।"

"কেন ?"

"আপনি বুঝবেন না। তাই বলছেন।"

"কেন, শুনিই না—।"

"বেশ তো, আপনি ছেলে খুঁজে দিন না।"

রঞ্জন তার উস্কোখুস্কো চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলালো

একটুখানি। তারপর বললো, "বেশ, তাই দিচ্ছি। আমায় বিয়ে করবে ?"

"এঁ্যা ?" সরমা অবাক হয়ে তাকালো রঞ্জনের দিকে। মুখ থেকে তার হুইস্কির গন্ধ বেরুচ্ছে, চোখ মুখ দেখলেই আর কথা বলার ধরন শুনলেই বোঝা যায় তার মনে এখনো নেশার ঘোর লেগে আছে, কিন্তু কথা যেগুলো এতক্ষণ বলছিলো তার মধ্যে অসংযত কিছু ছিলো না। কিন্তু একথা শুনে সরমা আবার ভাবতে শুরু করলো রঞ্জনের এই অবস্থায় তার সঙ্গে একা এদিকে আসা ঠিক হয়েছে কিনা।

তারপর হেসে ফেললো।

বললো, "আপনার শরীর ভালো নেই। চলুন বাড়ি যাই।"

রঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "তুমি কি ভাবছো আমি একটু মাতাল হয়ে আছি ? তা নয় সরমা, রঞ্জন গুহ খুব মদ খায় কিন্তু মাতাল হয় না। কেন জানো ? সে মদ খায় মাতাল হওয়ার জন্যে নয়, খায় একটা দুঃখ ভুলবার জন্যে, যেটা দিন রাত জ্বলছে।"

সরমা মুখে রুমাল চাপা দিলো। তারপর সেটি সরিয়ে খুব গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললো, "চলুন, বাড়ি যাই।"

সে কথায় কান দিলো না রঞ্জন।

বললো, "শোনো, বেশ কিছুদিন ধরে ভাবছি একটা কথা। মনে হচ্ছে, হয়তো একটা উপায় আছে। আমার এ দুঃখ তুমি ভুলিয়ে দিতে পারো। আর কেউ নয়, শুধু তুমি—কেন জানো ? কারণ তুমি একটা প্রতিভা নও, তুমি তিলোত্তমা নও, তুমি একটা অসাধারণ কিছু নও। তোমার যা কিছু জৌলুষ, সে তোমার শাড়িতে, তোমার ব্লাউসে, তোমার মেক্-আপ্-এ। আসলে তুমি একটি সাদা-সিধে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, যার মুখটা বেশ সুশ্রী আর মিষ্টি, যে

রেঁধে বেড়ে স্বামীকে দেওরকে খাইয়ে দাইয়ে রাখতে পারলে বেশ খুশী হয়। কিন্তু তাতো হবার জো নেই। পুরো সংসারের ভার তোমার উপর, তোমার টাকা দরকার, অথচ অভিনয় করে টাকা রোজগার করা ছাড়া আরো কিছু করবার সামর্থ্য তোমার নেই।"

সরমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

"প্রতিভা আমি অনেক দেখেছি," রঞ্জন বলে চললো, "তারা অদ্ভুত গান গায়, অভিনয় করে, বাজায়, নাচে। তারা প্রতিভা। সুতরাং তাদের বড়ো বড়ো সব আশা, বিরাট বিরাট স্বপ্ন। তারা আমায় সুখী করতে পারে নি। শুধু দুঃখই দিয়েছে। তুমি তাদের মতো নও। তাই মনে হোলো, তুমি আমায় সুখী করতে পারবে। তোমায় কিছু করতে হবে না। গান গাইতে হবে না, কোনো যন্ত্রে ওস্তাদি দেখাতে হবে না,—শুধু ঝোল ভাত রান্না করতে হবে, জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে সেটি সেলাই করে দিতে হবে, শীতকাল এলে সোয়েটার বুনে দিতে হবে, বাজারের হিসেব, ধোপার হিসেব ঠিক করে রাখতে হবে—ব্যস্, আমি আর কিছু চাই না। একটু শান্তি চাই, আর কিচ্ছু না। আমার বৌ আর যাই হোক, সে যেন ছবুলার মতো প্রতিভা না হয়, আমার ছায়াচিত্রের নায়িকা মীনার মতো আগুনের শিখা না হয়। আমি যা চাই, মনে হচ্ছে যেন তোমার মধ্যেই পাবো। তাই বলছিলাম, আমায় বিয়ে করবে?"

সরমা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এত মদ খাও কেন?"

"তোমায় বিয়ে করলে আর খাবো না," রঞ্জন উত্তর দিলো।

সেদিন সকাল থেকে বেশ ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। একটুখানি কাদা জমেছে ছবুলাদের বাড়ির সামনে।

ছবুলা স্থির করলো আজ আর বেরুবে না। সে উল নিয়ে সোয়েটার বুনতে বসলো।

কিছুক্ষণ পর কে যেন এসে দরজার কড়া নাড়লো।

উঠে এসে দরজা খুলে দিয়ে দেখে দীপক।

দীপক তার জুতো জোড়া বাইরে খুলে ভেতরে এসে বসলো।

"এই বৃষ্টিতে?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"চা খাবো। তাই এলাম," উত্তর দিলো দীপক।

ছবুলা একটু হেসে চায়ের জল চাপিয়ে এলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "পরশুদিন বিভিন্ন ক্লাবের যে মিটিংটা ডাকছো, তাতে সভাপতিত্ব কে করবে কিছু স্থির হোলো?"

দীপক চুপ করে রইলো প্রথমটা। ঘরের চারদিক দেখে নিলো তার ক্লান্ত চোখ দিয়ে। এক পাশে শুইয়ে রাখা ছবুলার তানপুরোটি দেখলো, ঘরের কোণে রাখা বাঁয়া তবলা জোড়া দেখলো, তার পাশে হারমোনিয়ামের বাক্সটি দেখলো, দেওয়ালে ঝোলানো সেতারটি দেখলো, ক্যালেণ্ডারে তারিখটি দেখলো, জানলা দিয়ে বাইরের এক জোড়া তালগাছের ওপারের আকাশটি দেখলো।

তারপর বললো, "মিটিং ডাকছি না।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো ছবুলা।

"অনেক ভেবে দেখলাম, যে জিনিস ভাবছি, সেটা আমার দ্বারা হবে না। এর অনেক অসুবিধে আছে, অনেক বাধা আছে, সেগুলো

পেরিয়ে যেতে হলে যে সংগঠন ক্ষমতা দরকার সেটা আমার নেই, যে সব সুবিধে থাকা দরকার, তাও নেই। যাক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। নতুন ভাবে যে একটা কিছু ভাবলাম তারই দাম অনেক। আমি কয়েকজনকে জানালাম, তাদের ভালো লাগলো, তারা আলোচনা করলো—কিছু করতে পারলো না। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু একদিন হয়তো কারো মনে লেগে যাবে এমন ভাবে যে সে শুধু এ নিয়েই উঠে পড়ে লেগে যাবে। আমার ক্ষেত্র এটা নয়, সে অন্য। আমায় শুধু নাটক তৈরি করতে হবে, নাটক অভিনয় করে যেতে হবে। আর, সব কিছু করতে হবে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এতে যদি সাফল্য আসে, তাহলে একদিন যখন সেই একজন কেউ ওই সংগঠনখানি গড়ে তুলবে, যার কথা আমি এদ্দিন ভাবছিলাম, তখন যদি তার সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াই আমার অভিনয়ের দলটিকে নিয়ে, আমার দেখাদেখি আরো অনেকেই তখন কোনো দ্বিধাবোধ না করে এসে পড়বে সেই নতুন নাট্য আন্দোলনের মধ্যে। তুমি কি বলো, ছবুলা?”

“ভালো করে ভেবে দেখ,” ছবুলা বললো “আমাদের বয়েস আস্তে আস্তে বাড়ছে। শুধু শখের উপর শৌখিন কিছু করবার বয়েস আমাদের আর নেই। এরপর যা করবো সে যদি আমাদের শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকবার পক্ষে সহায়ক না হয়, তাহলে ওসবের কোনো অর্থ হয় না।”

দীপক হাসলো একটুখানি।

বললো, “আমরা কতোখানি বদলে গেছি ছবুলা। এককালে বলতাম আমরা পয়সার জন্যে কিছু করছি না। করছি আর্টের জন্যে। সে জন্যে পয়সা রোজগার করবার কতকগুলো সুযোগ পেয়ে নিলাম না। এখন ভাবছি, আমাদের আদর্শ ছাড়বো না, কিন্তু

আর্টের জন্যে যাই করি না কেন, শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকবার পক্ষে সে যদি সহায়ক না হয়, এসব কোনো কিছুর কোনো অর্থ হয় না।"

ছবুলা চা করে নিয়ে এলো।

চায়ে চুমুক দিয়ে দীপক বললো, "কিছু টাকা যোগাড় করেছি। আমার এক বন্ধুও কিছু টাকা দেবে বলছে। ভাবছি নিউ এম্পায়ারে একটি বই নামাবো। নতুন বই নয়, পুরনো বই। রবীন্দ্রনাথের বই। এমন একখানি বই, যা কোনোদিন আর কেউ করতে সাহস করেনি। তাকে নতুন ভাবে উপস্থিত করবো সবার কাছে। তার পর ধরো শরৎ চন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন"। ঠিক তেমনি ধারা। তারপর পুরোনো নাট্যকারদের বই। এই ধরো "আলীবাবা"। লোকে এদ্দিন এর মধ্যে শুধু নাচ, গান আর এ্যাডভেঞ্চারটুকুই পেয়েছে। আমি এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক সমস্যা তুলে ধরবো, প্রকাশ করবো এর ভেতর দিয়ে সমাজচেতনার কোনো এক বিশেষ ভঙ্গী। দ্বিজেন্দ্র লালের 'চন্দ্রগুপ্ত,' 'শাজাহান'—যেগুলো এদ্দিন একভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে, আমি করবো কোনো এক নতুন টেকনিকে। আর তারপর সবাই যখন জানবে, তখন নতুন নতুন নাটক অভিনয় করবো। নতুন ভাবে সব কিছু ভাবতে হবে ছবুলা"—বলে দীপক একটু থামলো।

তাকালো ছবুলার মুখের দিকে।

তারপর বলে গেল, "—আর নতুন করে ভাবতে হবে তোমার আমার সম্পর্ক।"

ছবুলা তার চোখদুটি রাখলো দীপকের চোখের উপর।

জিজ্ঞেস করলো খুব স্থির ভাবে, "কেন ?"

দীপক তার চোখ নামালো না।

আস্তে আস্তে বললো, "ছবুলা, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে

এর মধ্যে নেমে পড়ো। আমি জানি, আমি বললে তুমি রাজীও হবে। কিন্তু এর জন্যে আমি তোমায় কী প্রতিশ্রুতি দিতে পারি ছবুলা ? কেন আমার জন্যে তোমার কিছু সময় নষ্ট হবে ? এসময়টা চারটে গানের টিউশানি করলেও তোমার অনেক লাভ।"

ছবুলা কোনো উত্তর দিলো না। তাকিয়ে রইলো দীপকের দিকে।

দীপক বলে গেল, "ছবুলা, এবার যা বলবো, খুব ভালো করে ভেবে দেখ। তোমার আমার চেনাশোনা, অনেক বছরের। তুমিও আমাকে জানো। আমিও তোমায় জানি। তুমি যদি আমায় বিয়ে করতে রাজী হও, তাহলে—"একটু থামলো দীপক, হঠাৎ চায়ের পেয়ালা-ধরা আঙুলগুলো কেঁপে উঠলো, একটুখানি চা উছলে পড়লো পিরিচে, তাড়াতাড়ি বলে গেল, "—আমি তোমার ভার নিতে চাই ছবুলা। তোমার ভবিষ্যৎ আমার ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়ে দাও, তারপর এসো দুজনে এক হয়ে কী করা যায় দেখি। জীবনের সমুদ্রমন্থনে অমৃত বা বিষ যাই উঠুক না কেন, সেটা তুমি আমি একসঙ্গেই গ্রহণ করবো।"

ছবুলা খুব আস্তে আস্তে বললো, "জানো, আমি কয়েকদিন ধরে এ ভয়টাই করছিলাম।"

স্বপ্নের স্বর্গ থেকে দীপক পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলো।

জিজ্ঞেস করলো, "ভয় ? ভয় কেন ?"

ছবুলা বললো, "জানো, আমার বাবা আছেন, ভাই আছে—।"

"হ্যাঁ, জানি," দীপক বললো, "এদ্দিন তুমি একাওঁদের দেখা-শোনা করছিলে, এখন থেকে তুমি আর আমি মিলে দেখবো।"

ছবুলা চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর বললো, "ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বোসো না

দীপক। ঘাড়ে সংসারের ভার চাপলে হয়তো জীবনে কিছুই করে উঠতে পারবে না।”

দীপক উত্তর দিলো, “আজ পুরো একটা বছর ভেবেই স্থির করেছি, ছবুলা। ঝোঁকের মাথায় আমি কিছু করি না। আর তুমি পাশে এসে দাঁড়ালে অনেক কিছুই করতে পারবো।”

ছবুলা হাসলো। বললো, “তুমি শুধু তোমার দিকটাই ভেবে দেখেছো। কিন্তু আমি তো এখনো আমার দিকটা ভেবে দেখিনি।”

“বেশ তো। আজ ভাবো। কাল বোলো।”

ছবুলা হেসে ফেললো, “তোমার বেলা একবছর, আর আমার বেলায় মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ?”

“বেশ, তোমার যখন খুশী জানিও।”

“যদি ভাবতে ভাবতে আমার সারা জীবন কেটে যায় ?” ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

“তাহলে সারা জীবন অপেক্ষা করবো।”

“ইতিমধ্যে অন্য সব কাজ ?”

“কাল থেকেই শুরু করবো। বই আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি। রবীন্দ্রনাথের ল্যাবরেটারি।”

“ল্যাবরেটারি ?” ছবুলা অবাক হয়ে বললো।

“হ্যাঁ, অনেকখানি দুঃসাহস দরকার হবে। কিন্তু দেখনা, কি করি।”

“আমি কি হিসেবে আসবো তোমাদের মধ্যে ?”

“পার্টনার হিসেবে। আমার যে বন্ধু টাকা দিচ্ছে সে, আমি আর তুমি,—আমাদের সমান ভাগ। আর এবার ঠিক পেশাদারী থিয়েটারের মতনই করবো সব। নতুন ধরনের সেটিং, নতুন ধরনের বিজ্ঞাপন।”

ছবুলা একটু চুপ করে রইলো।

মনে হোলো, রঞ্জন থাকলে আজ খুব হাসতো।

হাসলোই বা, ছবুলা ভাবলো, ও যে জিনিসের মধ্যে আমায় টেনে নিতে চেয়েছিলো, আমরা তো সে ভাবে কিছু করছিনা।

তবু নিজের অজান্তে ছবুলার চোখ দুটি একটুখানি সজল হয়ে এলো।

নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "মীনা আর বিমলের কি খবর?"

"ও, তোমায় বলিনি বুঝি?" দীপক বললো, "মীনা একটি সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে রাশিয়া যাচ্ছে।"

"কবে?"

"চার তারিখ।"

"আগামী মাসের চার তারিখ?"

"না, না, এমাসের চার তারিখ!"

"সে কি করে হতে পারে? চার তারিখ যে কাল চলে গেছে। আজ পাঁচ তারিখ।"

"তাইতো! তাইতো!!" দীপক বললো, "ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসা হোলো না। আমার নিজের ভাবনায় এতই মশগুল এই কদিন যে একথা খেয়ালই নেই। কিন্তু মীনাই বা এলো না কেন?"

"নানা কাজের ভিড়ে পেরে ওঠেনি বোধ হয়," ছবুলা বললো।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে। যাক, এসে তো যাবে তিন হপ্তা পরে। তিন হপ্তার বেশী দেখা হয় নি এমন কতোবার হয়েছে। ও ফিরে এলে ওর কাছে রাশিয়ার গল্প শোনা যাবে'খন।"

ছবুলা আর দীপক দুজনেই চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

তারপর দীপক বললো, "মীনা তাহলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি! আমি কিছু নই, তুমি কিছু নও, আর্টিস্ট প্রশান্ত সেন, যে আমার সঙ্গে আর্ট ডিরেক্টার হয়ে যোগ দিচ্ছে, সে কিছু নয়—"

ছবুলা বললো, "দীপক!"

কি যেন ছিলো তার গলায়, দীপক তার দিকে তাকালো।

ছবুলা বললো, "সে আমাদের ছোটো বোন, দীপক।"

"না. না, সে কথা বলছিনা, বলছিলাম কি—"

"দীপক, দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা আমাদের কারো ওর থেকে বেশী নয়, ওর থেকে কমও নয়। দেশের যে কোনো শিল্পী, অভিনেতা, নর্তক, সাহিত্যিক, গাইয়ে দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। একজন গেলেই হোলো। রাম না গিয়ে শ্যাম গেলে দেশের গৌরব একটুকুও বাড়বে না, যদু না গিয়ে শ্যাম গেলে দেশের গৌরব একটুকুও কমবে না। এ নিয়ে মনে কোনো আক্ষেপ রাখা উচিত নয়। লোকের মধ্যে যার পরিচিতি সব চাইতে বেশী, সে-ই এরকম সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে বাইরে যাবে, এ তো খুব সোজা কথা। মীনাকে তোমার আমার চাইতে অনেক বেশী চেনে সবাই। হোলোই বা সে ফিল্মস্টার। জনপ্রিয় এমনি এমনি হওয়া যায় না দীপক, তার জন্যে কিছু ক্ষমতা থাকা দরকার!"

দীপক চুপ করে শুনলো ছবুলার কথা। মুখ দেখে মনে হোলো ওর কথা মনে মনে মেনে নিলো সে।

মুখে বললো, "রিহার্স্যাল কাল বিকেল পাঁচটা থেকে। তুমি সাড়ে চারটের সময় এসো।"

"আচ্ছা।"

দীপক ছাতা খুলে পথে নেমে পড়লো।

সেই ঝিরঝির বৃষ্টি বিকেলেও থামলো না।

একটি গানের টিউশানি ছিলো। সুতরাং বেরোতে হোলো।

ফেরার পথে একটি সিনেমা হলের কাছাকাছি আসতেই বৃষ্টি আরো জোরে নামলো। ছবুলা সিনেমাটির গাড়িবারান্দার নিচে এসে দাঁড়ালো।

বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ নেই।

ভাবলো, এক কাপ কফি খেয়ে নিই। সিনেমাটির দোতলায় কফি হাউস। সেখানে উঠে এলো।

উঠে এসে দেখে এক কোণে একটি টেবিলে বিমল একা বসে আছে। তাকে দেখে ছবুলা সেখানে গিয়ে বসলো।

বললো, "কী ব্যাপার। তুমি হঠাৎ এখানে ?"

"এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। সারা দুপুর বসে স্ক্রিপ্ট্ লিখেছি। ভাবলাম একটু কফি খেয়ে যাই," বিমল উত্তর দিলো।

ছবুলার কফি এলো। চিনি মেশাতে মেশাতে ছবুলা বললো, "শুনলাম মীনা কাল রাশিয়া গেছে।"

"হ্যাঁ। ও তো এখন বিখ্যাত লোক।"

বিমলের কথা শুনে মনে হোলো এমন কিছু গৌরব সে অনুভব করছে না মীনার রাশিয়া যাওয়ায়।

"বিখ্যাত তুমিই বা কম কি," ছবুলা বললো। "চিত্রনাট্যকার হিসেবে তোমারও তো বেশ নাম হচ্ছে।"

"কী আর এমন নাম। হতে চেয়েছিলাম সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি। হলাম চিত্রনাট্যকার। পয়সা আছে, আর কিচ্ছু নেই। নিজের কিছু করবার স্বাধীনতা নেই। প্লট বলে দেবে অন্যলোক।

কি করে সাজাতে হবে, কি লিখতে হবে, সে সব বলে দেবে অন্যলোক।"

"এতো খুব স্বাভাবিক বিমল। যার টাকা এতে খাটছে, তোমারটা ভালো হওয়া না হওয়ার উপর তার সমস্ত লাভ-লোকসান নির্ভর করছে। তোমার লেখার কোনো সাহিত্যিক মর্যাদা তার কাছে তো থাকতে পারে না। তোমার লেখার বাজারদর বিচার করবার যোগ্যতা তার থাক বা না থাক, তার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।"

বিমল সিগারেটের টিন খুলে একটি সিগারেট ধরালো।

তারপর বললো, "যাই বলো, এতে দেখছি আমার কোনো লাভ নেই। আমি কি মীনার চাইতে কম খাটি? কিন্তু মীনাকে দেখ, তিন চারটে বই করেই সে এখন ভীষণ বিখ্যাত, আমাদের দেশের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে হলে তারও ডাক পড়ে, অথচ আমি এদ্দিন যা করলাম, কী তার দাম! সে টাকা মীনা পাঁচ ছ'দিনের শূটিং-এ পায়।"

ছবুলা হাসলো।

বললো, "মীনা তোমার বৌ। ওকে হিংসে করছো কেন? মীনা আজ যেখানে এসে পৌঁছেচে, সে তো অনেকটা তোমারই জন্যে। তুমি যে মীনাকে তৈরী করতে পেরেছো, এও কি কম সার্থকতা?"

"সেটা কে বোঝে?" বিমল মুখ ভার করে বললো।

ছবুলা হেসে ফেললো।

বললো, "অন্য কাউকে বোঝানোর এত গরজটা কিসের শুনি?"

"না, আমি সে কথা বলছি না," বিমল উত্তর দিলো, "আমি মীনার কথাই বলছি। সে তো এ কথা বোঝে না।"

"কেন, সে কি তোমায় কোনোদিন বলেছে যে তোমাকে না হলেও তার চলে ?"

"না, তা বলেনি—।" বিমল থামলো। সিগারেটে কয়েকটি দীর্ঘ টান দিলো। তারপর বললো, "ছবুলা, মীনা আর আগের মতো নেই—।"

"কে বললে ?"

"তুমি জানো না। ওর চলাফেরা কথাবার্তা সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেছে।"

"সেটা না হয়ে উপায় নেই বিমল। সব পেশায় এ জিনিস অল্পবিস্তর আছে। সিনেমা লাইনে এটা সব চাইতে বেশী। তাকে যে সর্বক্ষণ একটা পাব্লিসিটির আলোর মধ্যে থাকতে হয়। এ না করলে, তাকে লোকে ছুদিনেই ভুলে যাবে ; লোকে ভুলে গেলে, তার কোনো দাম থাকবে না প্রযোজকদের কাছে। ফিল্ম লাইনটা কতো নির্মম তুমি তো জানো বিমল। আজ তোমায় মাথায় তুলে নাচবে, টাকায় সম্মানে তোমায় ডুবিয়ে দেবে, কাল হয়তো কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। আজ তোমার গাড়ি দেখলে রাস্তায় ভিড় হবে, কাল তোমায় চিনতেও পারবে না।"

বিমল চুপ করে রইলো।

ছবুলা বলে গেল, "তোমার এরকম মনের ভাব হওয়া তো ভালো নয় বিমল। আজ তোমায় হয়তো বেশী কেউ চেনে না। কিন্তু তোমার কাজ তুমি করে যাও। একদিন না একদিন তোমার কাজের দামও তুমি পাবে।"

বিমল বললো, "জানো, একসময় মীনা আমায় জিজ্ঞেস না করে কিছুই করতো না। তারপর দেখতাম আমায় শুধু খবরটা দিতো মাত্র। শুধু এসে জানাতো, আজ এদের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট্ সই

করলাম, কাল ওদের পার্টি যাচ্ছি, পরশু অমুককে চায়ে ডাকছি। এবার রাশিয়া যাওয়ার যে আমন্ত্রণটা পেলো, আমায় সে কথা সে জানালোও না। আমি প্রথম জানলাম খবরের কাগজ পড়ে। ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন সে মার্কেট থেকে কি কি সব কেনাকাটা করে ফিরেছে। জিজ্ঞেস করতে, সে বললো, ও হ্যাঁ, তোমায় বলতে ভুলে গেছি। ওদের টেলিগ্রাম পেলাম দিন চার আগে। পরশু রওনা হচ্ছি। পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে কিছু মনেই ছিলো না। ভাগ্যিস দীল্লি থেকে নির্দেশ এসেছে, তা নইলে পাসপোর্ট এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই হোতো না। তার উপর 'পাখির নীড়' বইটার শূটিং-টা শেষ করে যেতে হচ্ছে। এদিকে শূটিং, ওদিকে এসব ঝামেলা, তার উপর মার্কেটিং, আমি আর পেরে উঠছি না। ও হ্যাঁ, তোমায় টাকা দিয়ে যেতে হবে, না? আমি তো ফিরবো তিন হপ্তা পরে। একটা চেক লিখে দিয়ে যাই?—আমি বললাম, আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমার হাতে টাকা আছে।—কাল ওকে প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। সেখানে এ এসে ফোটো তুলছে, ও এসে মালা দিচ্ছে, সে এসে হ্যাণ্ড-শেক্ করছে, এলাহী ব্যাপার। আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবার তার সময়ই হোলো না। সে চলে গেল। আমি ফিরে এসে এক বন্ধুর কাছে টাকা ধার করতে গেলাম। কারণ সত্যি সত্যিই আমার হাতে টাকা ছিলো না।"

ছবুলার মন একটুখানি বিষণ্ণ হোলো। সত্যি, এমন ছেলেমানুষ বিমলটা,—এখনো। বেচারী মীনা, বাইরের জীবনের তাল সামলাতে এমন নাজেহাল হয়ে আছে যে এদিকটা ভাববার অবকাশই পাচ্ছে না। বিমলকে খুবই বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই, তা নইলে নিশ্চয়ই একটু সজাগ থাকতো বিমলের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে।

একবার ভাবলো, বলি। তারপর স্থির করলো, না, এখন নয়, কিছুদিন যাক। মীনা ফিরে আসবার আগে একদিন বসে ভালো করে বুঝিয়ে বলা যাবে। তারপর মীনাকেও একদিন একটু আভাস দিলে, সে বুদ্ধিমান মেয়ে, ঠিক বুঝে চলতে পারবে।—বিয়ের পর কোথায় দুজনে মিলে হৈ হৈ করে বেড়াবে, তা নয়, এরই মধ্যে একজন আরেকজনের উপর অভিমান করতে শুরু করেছে।

ছবুলা চুপ করে রইলো। কিছু বললো না।

বিমল বলে গেল, "জানো ছবুলা, ওর আয় আমার চাইতে বেশী বলেই বোধ হয় সে আমায় এতখানি অবহেলা করে।"

"তোমার মাথা খারাপ," ছবুলা বললো।

বিমল কি যেন ভাবলো একটুখানি। তারপর বললো, "ছবুলা, একটি কথা কাউকে কোনোদিন বলি নি, হয়তো আর কাউকে কোনোদিন বলবোও না। তুমি আমাদের সবারই এত বন্ধু বলে বলছি। জানো, আমার এক এক সময় কী মনে হয়? মীনাকে হুট্ করে বিয়ে করে ফেলা বোধ হয় আমার উচিত হয়নি।"

"তুমি ক' কাপ কফি খেয়েছো, বিমল?"

"বেশী না, মোটে দু কাপ।"

"দু কাপ কফি খেয়েই তুমি মাতাল হয়ে গেছ?" ছবুলা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

বিমল যেন একটু আহত হোলো।

বললো, "ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি ছবুলা, বিশ্বাস করো আমায়। কাউকে বিয়ে করবার আগে একটু ভালো করে দেখে শুনে নিতে হয়।"

ছবুলা হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, "কেন, আজ চার পাঁচ বছর ধরে তো মীনাকে দেখে আসছো। এতেও হয়নি?"

"না, ছবুলা। ওকে আমি চিনি বটে চার পাঁচ বছর ধরে,—চার পাঁচ বছর কেন? তারও বেশী,—কিন্তু ওকে আমি কোনোদিনই বিয়ে করবার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখিনি। ওর সম্বন্ধে প্রথম মন দুর্বল হোলো কখন জানো? সেই নিউ এম্পায়ারে শো-এর দিন, যেদিন আমার লেখা গানের সঙ্গে সে নেচেছিলো। কিন্তু তার আগে আমি স্বপ্ন দেখতাম আরেকজনকে—"

"তাই নাকি! কী অন্যায়--," বলে ছবুলা হেসে উঠলো।

"তুমি হাসলে ছবুলা? কিন্তু জানো না, সে আজ দুতিন বছর ধরে আমার মনের কতোখানি জুড়ে বসেছিলো। আমার যা কিছু, সব তারই জন্যে। আমার নাটক লেখা, কবিতা লেখা, সব কিছুর মধ্যে ছিলো তারই প্রেরণা। সেই প্রথম আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিলো আমার মনে।"

"কী কাণ্ড!" ছবুলা চোখ বড়ো বড়ো করে বললো, "তাহলে তাকে বিয়ে করলে না কেন?"

"তার কাছে আর যেতে পারলাম না ছবুলা। খুব কাছে থেকেও দূরে দূরে রইলাম। তারপর আর না পেরে একদিন যখন স্থির করলাম তার কাছে আমার মনের পর্দা তুলে ধরবো, তখন দেখি কোত্থেকে আরেকজন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তাই, তার কাছে গেলাম না। দূরে দূরেই রইলাম—।"

"আহা, বেচারা!" ছবুলা বললো। "যাক, যা হবার, তাতো হয়ে গেছে। এখন তো আর কিছু করবার নেই। সুতরাং, কেন আর অতো সব ভেবে দুঃখ করছো।"

"তুমি জানো না ছবুলা। মীনাকে পেয়ে তাকে ভুলে থাকতে

চেয়েছিলাম, কিন্তু আজকাল আবার তার কথা খুব বেশী করে মনে পড়ছে।”

“তাই নাকি? কে সে?” ছবুলা হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলো।

“বলবো?” বিমল জিজ্ঞেস করলো।

“বলো না।”

বিমল একটু ভাবলো। তারপর চুপ করে রইলো।

“কাউকে বলবো না,” ছবুলা হাসিমুখে বললো, “মীনাকেও না।”

“তুমি কেন আর জানতে চাইছো, ছবুলা?” বিমল জিজ্ঞেস করলো।

“শুনিই না মেয়েটির নাম। তাহলে আমার পক্ষে প্রমাণ করে দেওয়া খুবই সহজ হবে যে সে মেয়েটির চাইতে মীনা অনেক, অনেক ভালো মেয়ে।”

বিমল একবার ভালো করে তাকালো ছবুলার দিকে।

তারপর আস্তে আস্তে বললো, “সে তুমি পারবে না ছবুলা।”

“কেন?”

“মেয়েটি সত্যি সত্যি মীনার চাইতে অনেক উঁচুদরের মেয়ে।”

“এ হয়তো শুধু তোমার নিজেরই ধারণা—।”

“সবাই বলে সেই মেয়েটি অনেক ভালো।”

“তাই নাকি? খুব বিখ্যাত মহিলা মনে হচ্ছে,” ছবুলা হাসিমুখে বললো, “শুনি তার নাম।”

“শুনবেই?”

“হ্যাঁ, শুনিই না।”

বিমল চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

একটি সিগারেট ধরালো।

তারপর বললো, "শুনলে রাগ করতে পারবে না বলে দিচ্ছি—।"

"না, না, রাগ করবো কেন। তোমার কাকে ভালো লাগে না লাগে, তা নিয়ে আমি রাগ করতে যাবো কেন?"

বিমল আস্তে আস্তে বললো, "ছবুলা, সে তুমি।"

বলতে বলতে লাল হয়ে গেল বিমলের কান দুটো।

ছবুলা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বিমলের দিকে। একথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

হঠাৎ একটু রাগ হোলো বিমলের উপর। সে তাকে কী মনে করেছে?

তারপর ভাবলো, রাগ করে কী হবে। বেচারার মন মেজাজ ঠিক নেই। সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে?

ছবুলার মুখে আস্তে আস্তে একটা খুব সহজ হাসি ফুটে উঠলো।

বললো, "বিমল, তোমার সত্যি সত্যি কি হোলো বলো তো? মীনার এত নাম, মীনা এরকম সুন্দর দেখতে, এত বড়ো প্রতিভাধর শিল্পী—সে যখন রাশিয়ায় গেছে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে, তখন তুমি একটি সিনেমা হাউসের দোতলার কফি হাউসে বসে একটি অতি সাধারণ মেয়ে, যে সারাদিন গানের টিউশানি করে বেড়ায়, তাকে বলছো সেই তোমার মন জুড়ে বসেছে তোমার বিয়ের অনেক আগের থেকে! মীনা যদি কোনোদিন জানতে পারে তার মনে কতোখানি লাগবে ভেবে দেখতো?"

"আমি জানতাম যে তুমি জানলে খুব রাগ করবে," বিমল সিগা-

রেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো, "কিন্তু বলে ফেলে এখন আমার মন অনেক হাল্কা হয়ে গেল।"

একটু থামলো সে, তারপর হঠাৎ খুব ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলো।

বললো, "ছবুলা, আমি কি কোনোদিন ভেবেছিলাম, আজ বসে বসে শুধু সিনেমার স্ক্রিপ্‌ট্‌ লিখবো ? এই হবে আমার পেশা ? বেশ তো পড়াশুনো করছিলাম কলেজে, জানতাম পাশটাশ করে বেরিয়ে চাকরি বাকরি করবো, দশটা পাঁচটা অফিস করবো, সকালে চটের থলে হাতে নিয়ে শার্ট আর নীল লুঙ্গি পরে বাজার করে আসবো, বিকেলে বসে তাস খেলবো। আর দশজন বাঙ্গালী ছেলের মতো কবিতা লিখতাম, বন্ধুদের পড়িয়ে শোনাতাম। দীপকের বাড়িতে একদিন কবিতা শুনে তুমি বললে, গান লেখো, আমি গাইবো। সেই তো আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলে ছবুলা। বললে, নাটক লেখো, আমরা অভিনয় করবো। ব্যস, আমার নেশা ধরিয়ে দিলে তখন থেকে। যেদিন লিখতে শুরু করেছি, সেদিন থেকে আমার প্রত্যেকটি লেখার মধ্যেই তুমি অনুপ্রেরণা হয়ে মিশে আছো। তোমার জন্যে লিখবো বলেই লিখতাম। অন্য কোনো আকর্ষণে নয়। সেই তুমি হঠাৎ সরে গেলে। আমি সামনে যাকে পেলাম তাকেই আঁকড়ে ধরে ভেসে পড়লাম। আর এখন বসে বসে প্রযোজকদের জন্যে কতকগুলো অসম্ভব, অর্থহীন, অবাস্তব কাহিনীর চিত্রনাট্য লিখছি। না, পেটের তাগিদে নয়, লিখছি মান বজায় রাখার তাগিদে, তা না হলে আমার নিজের কোনো পরিচয়ই থাকে না।"

ছবুলা কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলো। তার প্রশান্ত চোখ দুটো স্থির হয়ে রইলো বিমলের চোখের উপর।

বিমল বলে গেল, "আমি জানি, যা হবার হয়ে গেছে, এ আর বদলানো যাবে না। কিন্তু ছবুলা, তোমার পক্ষে কি এতই অসম্ভব, আমাকে দিয়ে আবার ভালো জিনিস লেখানো। রঞ্জন সিনেমার নায়ক, তাই নিজে কতোগুলো তৃতীয় শ্রেণীর গান লিখে সেগুলো নিজে গেয়ে সেগুলোকে জনপ্রিয় করতে পারছে। আর তুমি আমি মিলে কিছু করতে পারবো না? আমায় আবার তোমার কাছে ডেকে নাও ছবুলা, আমায় আবার প্রেরণা দাও—।"

"আস্তে, আস্তে। আশেপাশের লোকজন শুনলে কী ভাববে বলতো?"

"ছবুলা!—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি যা বলতে চাইছো, সবই বুঝেছি। কিন্তু মীনা তোমায় এত ভালোবাসে, তার মনে কতখানি লাগবে ভেবে দেখ তো!"

"সে আমায় একটুও ভালোবাসে না। তার মনে একটুও লাগবে না। সে ওর মতো থাকবে। আমি আমার মতো। তারপর আমি আর তুমি, সেই আগের মতো—।"

"বয়টাকে ডাকো বিমল। বিলটা নিয়ে আসুক এবার উঠতে হবে।"

বয় এলো। বিল মিটিয়ে দেওয়া হোলো।

ছবুলা রাস্তায় নেমে এলো বিমলকে সঙ্গে নিয়ে।

আর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই মন স্থির করে ফেললো ছবুলা।

বললো, "বিমল, আমার বাড়ি অনেকদিন আসো নি। যাবে আমার সঙ্গে? চা আর তেলেভাজা খাওয়াবো। বাড়ির কাছেই একটি দোকান আছে। চমৎকার তেলেভাজা করে।"

"শুধু চা আর তেলেভাজায় চলবে না। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। আচ্ছা, আজকাল রেডিওতে তোমার গান শুনিনা কেন বলো তো ?"

"প্রোগ্রাম আর পাই না বলে।"

"কেন পাও না ?"

"তাতো জানি না।"

"তোমার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারে না এমন কতো লোক প্রোগ্রাম পায়।"

"হ্যাঁ, তা পায়।"

"না, না, এ চলতে পারে না, ছবুলা। আচ্ছা দাঁড়াও। রেডিওর একজন কর্তাকে আমি চিনি। দেখি আমি কি করতে পারি!"

ছবুলা কোনো উৎসাহ দেখালো না। চুপ করে রইলো।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু বেশ মেঘলা সন্ধ্যে। হাজরা-রসা রোডের মোড় জলে চিক চিক করছে। মিটিং হচ্ছে হাজরা পার্কে। লাউড স্পীকারের ভেতর দিয়ে বক্তৃতা ভেসে আসছে।

একটি দোতলা বাস পাশ কাটিয়ে গেল।

"কদ্দিন তোমার গান শুনিনি ছবুলা," আকাশের দিকে চোখ ভাসিয়ে বিমল বললো। একটু থামলো। তারপর বললো, "কদ্দিন তেলেভাজা খাইনি। আজকাল বাড়ির রেওয়াজ বদলে গেছে। ওসব জিনিস বাড়িতে আর আসে না।"

বিমল যখন বাড়ি ফিরলো তখন রাত প্রায় সাড়ে নটা।

খাওয়া দাওয়া সেরে যখন শুতে গেল তখন খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে।

বিমলের চোখে ঘুম এলো না অনেকক্ষণ।

সন্ধ্যায় শোনা সাওয়ানি কল্যাণের শুদ্ধ মধ্যমের জাদু তখনো তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সারা সন্ধ্যা ছবুলা তাকে গান শুনিয়েছে একটার পর একটা। পুরিয়া ধানেশ্রী দিয়ে শুরু করে, শুদ্ধ কল্যাণের পর সাওয়ানি কল্যাণ গেয়ে, তারপর কাফিতে একটি ঠুংরি।

কদ্দিন সে এরকম গান শোনেনি—।

আজ মনে হোলো আর্থিক স্বাচ্ছল্যের জন্যে ফিল্ম লাইনে এসে তাকে যেন অনেক কিছু হারাতে হয়েছে, হারাতে হয়েছে আগের দিনগুলো যখন জীবনের উপর একটা ভালোবাসা ছিলো।

মীনাকেও সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো।

আজ বিমলের মনে হোলো তাকেও যেন হারাতে বসেছে।

মনে পড়লো মীনার কথা।—আজ তার তাশকন্দ্ পৌঁছানোর কথা। হয়তো সেখানে এখনো গোধূলি, মীনা সাহা আর তার সঙ্গীদের ঘিরে সে দেশের মেয়ে পুরুষের ভিড়।

আর এখানে বাইরে অঝোর বৃষ্টি, আকাশে ঘনঘটা, জানলার ওপারে ঘন ঘন বিজলীর চমক, তারপর ঘর দোর কাঁপিয়ে মেঘের গর্জন। একলা ঘরে, জোড়া খাটের উপর সে একলা শুয়ে এলোমেলো নানাকথা ভাবছে।

সে হয়তো ভাবছে মীনার কথা, কিন্তু তার কথা ভাববার মীনার অবকাশ কোথায়!

কিন্তু ছবুলা?

তারই কথা বিমল বেশী করে ভাবলো। সে হয়তো এখনো জানলার ধারে বসে গান গাইছে। কী গাইছে? হয়তো দরবারি কানড়া গাইছে, কিম্বা হয়তো চন্দ্রকোশ। নয়তো বা মল্লার কোনো একটা।

তার কথা কি ভাবছে না সে ?

অনেক ভেবেও নিজেকে বোঝানোর কোনো যুক্তি সে পেলোনা যে ছবুলা তার কথা ভাবছে।

যাক। সে যে এখনো গান গাইছে, সে কথা ভেবেই বিমল সাহার মন খুশিতে ভরে গেল।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লো তার মনে নেই।

বিমল চলে যাওয়ার পর ছবুলা একটুখানি হেসেছিলো নিজের মনে। তারপর ভাইকে পয়সা দিয়ে পান আনতে পাঠিয়েছিলো মোড়ের দোকানে।

রাত যখন সাড়ে ন'টা তখন ওর ভাইকে আর বাবাকে খাইয়ে সে নিজে খেতে বসেছে।

বাইরে খুব জোর বৃষ্টি নেমেছে।

ভালো লাগলো না ছবুলার।

এই বৃষ্টিতে কলতলায় বসে বসে বাসন মাজতে হবে। উঠোনে জল জমেছে এরই মধ্যে। যেখানে জলের চৌবাচ্চা তার উপরে শুধু একটি পুরোনো টিনের ছাউনি। তাতে অসংখ্য ফুটো।

বাসন মাজতে মাজতে ছবুলা ভাবলো বিমলটা এমন ছেলে-মানুষ।

কাজ টাজ সেরে, ঘরের ভিতর এসে ছবুলা পান খেলো একটা। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আকাশটা একবার দেখে নিলো। তারপর ঘরের ভিতরে এদিক ওদিক দেখে নিলো।

এক কোণে টিপ টিপ করে জল পড়ছে।

সেখানে একটি গামলা বসিয়ে দিলো।

তারপর আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

দীপক মিত্রের নতুন বইয়ের রিহার্স্যাল শুরু হয়ে গেল পুরো দমে। প্রধান ভূমিকায় দীপক আর ছবুলা।

একদিন ছবুলা রিহার্স্যাল থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

দীপক কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সেও কিছু বললো না।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর সাড়ে দশটা নাগাদ রেডিও খুলে দিয়ে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়তেই শুনলো রেডিওর ঘোষণা, ঠুংরি গাইছে ছবুলা গাঙ্গুলী।

দীপক তড়াক করে উঠে বসলো। ওব প্রোগ্রাম আছে তাতো জানায় নি। আজ তো বছর খানেক সে প্রোগ্রাম পায় না। তাও সে আগে গাইতো প্রধানত রাগপ্রধান বা হাল্কা ক্লাসিকেল জাতীয় গান। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রোগ্রাম এর আগে ওকে দেওয়া হয়নি কোনোদিন। হঠাৎ কি করে হোলো?

খবরের কাগজটি তুলে দেখে সন্ধ্যে সাড়ে আটটা থেকে ন'টা ছবুলার খেয়ালের প্রোগ্রাম ছিলো।

কিন্তু—কিন্তু তাকে একবারও বলেনি কেন, দীপক ভাবলো।

তারপরদিন দেখা হতে জিজ্ঞেস করলো ছবুলাকে।

ছবুলা বললো, "বড্ডো ভুল হয়ে গেছে। তোমায় বলতাম, কিন্তু রিহার্স্যালের হৈ চৈ-এর মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম। বাইরে বেরিয়ে মনে পড়লো। যাক, এর পরের বার যখন প্রোগ্রাম পাবো, নিশ্চয়ই জানাবো।"

"কিন্তু হঠাৎ পেয়ে গেলে কি করে?"

"বিমল কি করে যেন ব্যবস্থা করেছে," ছবুলা উত্তর দিলো।

"বিমল! আমাদের বিমল?"

"হ্যাঁ," ছবুলা হেসে বললো। "আজকাল তো ওর অনেকের সঙ্গে জানাশোনা। রেডিওর কার সঙ্গে যেন ওর খুব ভাব।"

"ও," বলে দীপক চুপ করে গেল।

হঠাৎ কিরকম যেন একটু জ্বালা ধরলো তার মনে। বিমলের সুপারিশে প্রোগ্রাম পেতে হবে ছবুলাকে? ছবুলা কি করে বলতে পারলো তাকে?

জিজ্ঞেস করলো, "বিমলের সঙ্গে তোমার দেখা হয় বুঝি?"

"হ্যাঁ, ও তো আজকাল প্রায়ই আসে আমাদের ওখানে। মীনা এখানে নেই, বেচারা একা একা বাড়ি বসে কী করবে," ছবুলা বললো।

দীপকের মনের কোণে এক টুকরো কালো মেঘ দেখা দিলো।

মীনা এখানে নেই। তাই বলে বিমলের আর কিছু করবার নেই? সে ফিল্ম্ লাইনের লোক, তার আড্ডা দেওয়ার লোক বা জায়গার অভাব! দীপকের বোনকে সে বিয়ে করেছে, কই, তার বাড়িতে তো বড়ো একটা আসে না। তার সঙ্গে ঝগড়া হয়নি, মনোমালিন্য হয়নি, কিছুই হয়নি, না আসবার কোনো কারণ নেই। তার কাছে নয়, অন্য কোথাও নয়—শুধু ছবুলার কাছে কেন? হ্যাঁ, ছবুলাও তার অনেকদিনের চেনা, ওদের মধ্যে যে যাওয়া আসা ছিলো না, তাও নয়—কিন্তু গত দুবছরের মধ্যে বিমল ছবুলার বাড়ি গেছে বা ওর খোঁজ করেছে বলে তো শোনা যায় নি। ফিল্ম্ লাইনের লোক সে, নিজের গণ্ডির বাইরে পা বাড়ানোর সময় পাওয়ার কথা নয়, সে এখন যাতায়াত করছে ছবুলার বাড়ি,

আর রেডিওর প্রোগাম পাইয়ে দিচ্ছে তাকে, যেখানে তার প্রোগ্রাম পাওয়া বন্ধ অনেকদিন ধরেই !

হঠাৎ মনে পড়লো অনেকদিন আগেকার কথা।

ছবুলার কাছ থেকে কোনো কিছু লেখার ফরমাশ এলেই সে নাওয়া খাওয়া ভুলে সে কাজ আগে শেষ করে ছুটে আসতো ছবুলার কাছে।

এরা ঠাট্টা করতো সবাই।

বিমলের কান লাল হয়ে যেতো।

এসব এমন কিছু নয়—কিন্তু আজ এসব সামান্য ব্যাপারগুলো কেঁপে উঠে অন্য রকম ভাবে হাজির হোলো দীপকের মনে। কই সে যখন ছবুলার কাছে বিয়ের কথা পেড়েছিলো, সে তো খুব এমন কিছু উৎসাহ প্রকাশ করে নি।

সে নিজেও তো খুব বেশী যায় না ছবুলার বাড়ি। রিহার্স্যালে দেখা হয়, এই পর্যন্ত। ছবুলা নিজের থেকেও তো তাকে কোনো দিন বাড়িতে যেতে বলেনি।

আগের থেকে বললে পরে তবে এর ওর বাড়ি যাওয়া, সে সম্পর্ক যে তাদের মধ্যে কোনোদিনই ছিলো না একথা ভুলে গেল দীপক মিত্র।

ভুলে গেল এত বছরের এতখানি অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও।

ভুলে গেল কারণ তার মনের সেই এক টুকরো মেঘ তখন তার সারা মন ছেয়ে ফেলেছে।

বিমল একদিন ছবুলার কাছে উপস্থিত হোলো খুব হাসি হাসি মুখে।

বললো, "ছবুলা, একটা সুখবর আছে।"

"কি সুখবর, শুনি!" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"আমার লেখা একটি নতুন গল্প সিনেমা হচ্ছে। এ বইতে অনেক গান আছে। সবই ক্লাসিকেল গান। গানগুলিও আমারই লেখা। একটি গাইয়ে মেয়ে আর গাইয়ে ছেলেকে নিয়ে গল্প। কাল এদের পরিচালক এসে আমায় ধরে পড়েছে নায়িকার গানের প্লে-ব্যাক তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে। রেডিওতে তোমার খেয়াল আর ঠুংরি ওর নাকি খুব ভালো লেগেছে।"

"তুমি তো জানো, বিমল, ফিল্মে প্লে-ব্যাকের গান গাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই! চাইলে তো আমি অনেক আগেই পেতাম," ছবুলা বললো।

"ছবুলা, সাধারণত যে সব গান সিনেমায় হয়, এ বইয়ের গান-গুলো সেরকম নয়। এগুলো সবই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এসব গান গাইবার মতো মেয়ে তো খুব বেশী নেই। যে কয়জন আছে তাদের সব বইতেই এত বেশী শোনা যায় যে প্রযোজকেরা এখন নতুন লোক খুঁজছে। তুমি যদি রাজী হও, তোমার তো কোন ক্ষতি নেই। ভালো টাকা তো পাবেই, তার উপর আরো নাম হবে। এমনি তোমার যতোই নাম থাক, ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হবার একটি প্রধান মাধ্যম যে সিনেমা, তাতো অস্বীকার করতে পারো না।"

ছবুলা একটু ভাবলো।

তারপর বললো, "না, বিমল। ওসব আমার দ্বারা হবে না। কে না কে এসব গানে সুর দেবে—"

তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে বিমল বললো, "এই বইটির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন পণ্ডিত রামআওতার মিশ্র।"

"পণ্ডিত রামআওতার মিশ্র!"

ছবুলা অবাক হোলো। পণ্ডিতজী একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ

এবং সে যুগের বিখ্যাত খেয়াল গায়ক উস্তাদ আলি মুশারফ খানের শিষ্য।

ছবুলা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ—।

তারপর রাজী হয়ে গেল।

বিমল ভীষণ খুশী।

বললো, "ওরা বলেছে তুমি যদি রাজী হও তো কালই ওরা এসে কাগজপত্তর সই করবে আর চেক দিয়ে যাবে।"

"কে কে নামছে এ বইতে ?" ছবুলা জিজ্ঞেস করলো।

"একরকম আমাদেরই ঘরোয়া ব্যাপার," বিমল বললো, "নায়িকার ভূমিকায় মীনা, আর—," একটু থামলো সে।

"নায়কের ভূমিকায় ?"

একটু ইতস্তত করে বিমল বললো, "রঞ্জন।"

শুনে ছবুলা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "যাক, যে নামবে নামুক, আমার তাতে কি।"

বিমল সেদিন বেশীক্ষণ বসলো না। উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি। বললো, "সেই পরিচালক ভদ্রলোকটিকে খবর দিতে হবে।"

দিন ছয় সাত পর রঞ্জন শুনলো যে বিমলের নতুন বইটিতে নায়িকার গানগুলো গাইছে ছবুলা।

শুনে সে অবাক।

সরমাকে বললো, "জানো, ছবুলাও শেষ পর্যন্ত এ লাইনে এলো।"

"ভালোই তো", সরমা এমন কিছু গুরুত্ব আরোপ করলো না ঐ খবরের উপর।

"তুমি জানো না সরমা," রঞ্জন বললো, "ফিল্ম্‌ লাইন সম্বন্ধে ছবুলার কি রকম নাক-উঁচু ভাব ছিলো।"

"ফিল্ম্‌ লাইন কেন, সব ব্যাপারেই ছবুলাদির বড্ড নাক-উঁচু ভাব। ওর বড্ড দেমাক। নিজেকে খুব বড়ো গাইয়ে মনে করে," সরমা উত্তর দিলো।

রঞ্জন একটু অবাক হয়ে তাকালো সরমার দিকে। সরমা এত ছবুলা-বিরোধী হোলো কবে থেকে?

"ও তো তোমার মতো লোককেও কোনোদিন আমল দেয় নি," সরমা হাসি মুখে বললো।

"তুমি কি করে জানলে?"

"তোমার সঙ্গে যে ছবুলাদির খুব ভাব ছিলো এক সময় সে কথা আমরা শুনেছিলাম।"

রঞ্জন ভাবলো, একবার বলি যে তোমারই একটা ব্যাপারে গোলমাল বেধে ওঠায় ওর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি।—তারপর ভাবলো, যাক, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

মনে মনে একটু খুশীও হোলো ছবুলা তাকে আমল না দেওয়ায় সরমা ছবুলাকেই করুণা করছে দেখে।

সরমা বলে গেল, "যাক, সে যে তোমায় চিনলো না, তাতে আমারই লাভ। তা নইলে আমি তো তোমায় পেতাম না। পথের ধারে হীরে পড়ে আছে দেখলে পাকা জহুরীও ভুল করে ভাবে সেটি কাচের টুকরো। তাতে সাধারণ পথিকেরই লাভ।"

রঞ্জন আরো খুশী হোলো।

কিন্তু তবু কেমন যেন অভিমান হোলো ছবুলার উপর।

সে যখন বলেছিলো, তখন তাকে আদর্শ, এটা, ওটা, সেটা নিয়ে কতো দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলো ছবুলা।

আর বিমল সাহা বলতে না বলতেই ছবুলা সুড়সুড় করে ফিল্মে গান গাইতে এলো!

হঠাৎ মনে পড়লো. হ্যাঁ, তাইতো! বিমল মীনার স্বামী।

আর সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনের গায়ে জ্বালা ধরলো।

কী? বিমলের বিয়ে হয়ে গেছে, এর পরও?

ছবুলা! ছবুলার মতো মেয়ে!

"কী অতো ভাবছো," সরমা জিজ্ঞেস করলো।

"কিচ্ছু না।"

সরমা বললো, "তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছিলাম—।"

"কি?"

"এ বইতে নায়িকার ভূমিকায় মীনার নামবার কথা কি ঠিক হয়ে গেছে?"

"না, এখনো হয়নি। ও রাশিয়া থেকে ফিরে আসুক। তারপর পাকাপাকি কথা হবে।"

"তুমি একবার আমার জন্যে চেষ্টা করে দেখ না। ওরা তোমার কথা নিশ্চয়ই রাখবে।"

"তুমি নামবে সিনেমায়?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো চোখ কপালে তুলে।

"ক্ষতি কি? আমার তো খুব ইচ্ছে," বললো সরমা।

রঞ্জন বললো, "আমি চাই না যে তুমি সিনেমায় নামো।"

"কেন?"

রঞ্জন মাথা নাড়লো।

সরমাকে নিয়ে রঞ্জন খেতে গেল চৌরঙ্গির এক বিখ্যাত রেস্তরাঁয়।

দেখলো দূরে এক কোণে বসে আছে বিমল আর ছবুলা।

রঞ্জন প্রথমটা দেখেনি। সরমাই দেখিয়ে দিলো।

ওরা এদের দেখেনি।

বিমল তখন খুব কথা বলে যাচ্ছে হাসি মুখে। তার মনের আনন্দ চোখে মুখে উপচে পড়ছে। ছবুলাও তার কথার উত্তর দিচ্ছে হাসি হাসি মুখে, তবু তার আড়ষ্টতা খুবই স্পষ্ট। এ সব জায়গায় সে আগে কোনোদিন আসেনি। চারদিকে অন্যান্য মেয়েদের জমকালো শাড়ি চোলি প্রসাধনের মাঝখানে ছবুলার সাদাসিধে তাঁতের শাড়ি, শালীন ব্লাউস আর পরিষ্কার মুখ চট্ করে সবারই চোখে পড়ে।

রঞ্জন দেখলো, অবাক হয়ে দেখলো।

সরমা রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসলো।

জিজ্ঞেস করলো, "মীনা কবে ফিরবে রাশিয়া থেকে ?"

"দিন দশ পোনেরো পরে।"

"বিমল বেশ ফুর্তিতে আছে, না ?" সরমা মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, ও বেশ ফুর্তিবাজ ছেলে।"

সরমা রুমাল দিয়ে নাকের ডগার ঘামটুকু পুঁছে নিলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "এ জন্যেই কি তুমি আমায় ফিল্মে নামতে দিতে চাওনা ?"

রঞ্জন কোনো উত্তর দিলো না।

"আমার তো মনে হয় এতে তোমারই লাভ।"

"কেন", রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

"আমি রাশিয়া গেলে, এখানে তুমিই ছবুলার সঙ্গে বসে গল্প করবে।"

হঠাৎ একটু রাগ হোলো রঞ্জনের। একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। বোকা মেয়ে, অনেক কথাই না বুঝে বলে, রঞ্জন ভাবলো।

রাগ সামলে নিয়ে একটু হেসে বললো, "আর, যখন আমি রাশিয়া যাবো, তখন কি হবে ?"

সরমা হেসে ফেললো, বললো, "যাও, তুমি খুব দুষ্টু—।"

এ উত্তর শুনে রঞ্জন একটুও পুলক অনুভব করলো না।

ছবুলাকে বিমলের সঙ্গে এরকম একটি জায়গায় বসে গল্প করতে দেখে তার মনের সমস্ত রঙ তখন ধূসর হয়ে গেছে।

দীপক সেদিন খুবই অবাক হয়ে গেল ছবুলা যখন বিমলকে নিয়ে এলো তাদের রিহার্স্যালে।

ভগ্নীপতিকে খুব সাদর সম্ভাষণ জানালো সে।

"এসো, এসো, কী ব্যাপার, তুমি তো আজকাল আসোই না। মীনা কবে ফিরছে রাশিয়া থেকে ?"

"পরশু।"

ছবুলা বললো, "খুব ভালো খবর আছে দীপক। বিমল আবার আমাদের মধ্যে আসছে।"

"সে কি ? বিমল তো আমাদের কোনোদিনই ছেড়ে যায় নি— !"

দীপকের সৌজন্যে বিমল একটু অপ্রস্তুত হোলো।

বললো, "না, না, তা নয়। তবে মাঝখানে যোগাযোগটা কমে গিয়েছিলো, এই আর কি।"

ছবুলা বললো, "বিমল আমাদের জন্যে আরেকটি নাটক লিখেছে। আমি ওকে বলেছিলাম। বলতে না বলতেই তিনদিনের মধ্যেই

লিখে দিয়েছে। জানো, আলিবাবার গল্পের উপর নাটক। তবে এবার একটু অন্যধরনে লেখা। নাচ গান আছে, কিন্তু শুধু নাচ গানই এর উপজীব্য নয়। সে এর মধ্যে একটা নতুন সামাজিক-চেতনার ভঙ্গী এনেছে। এটার প্রযোজনা, মঞ্চসজ্জা এগুলোও হবে একটু নতুন ধরনের।"

দীপক হেসে ফেললো। ছবুলা বলতে না বলতেই তিনদিনের মধ্যে নাটক? কিন্তু মনে মনে একটু জ্বালা ধরলো।

মুখে বললো, "উপস্থিত একটা নিয়ে তো খুবই বিব্রত আছি—।"

ছবুলা বললো, "ওটা শেষ হতে না হতেই এটা ধরবো। একটু পেশাদারী ভাবেই যদি করতে হয়, অনেকদিন পর পর একটা করে করলে তো চলবে না। আর আমাদের নিজেদের হল নয় যে একটা বইতেই সাড়ে নয় শো রাত রান্ দেবো। একটা শেষ হলেই আরেকটি নতুন বই করতে হবে, আর ইতিমধ্যে চাহিদা হলে আগের বইয়ের রিপীট্-পারফরমেন্স দিতে হবে।"

"কিন্তু একটা বই শেষ হলেই আরেকটি করবার তো কতকগুলো অসুবিধে আছে—।"

"সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না দীপক," ছবুলা বললো, "এটার জন্যে যা খরচা হয়, সেটা বিমল দেবে।"

দীপকের চোখ কপালে উঠলো।

"এ বইতে তুমি নামবে, আমি নামবো, আর—আর বিমলও নামবে। বিমল আগে কোনোদিন অভিনয় করেনি, কিন্তু এবার—পারবে না বিমল?"

দীপকের চোখ ঠিকরে কোটর থেকে বেরিয়ে পড়তে চাইলো।

"আরো একটি মেয়ে চাই, যে নায়িকার ভূমিকায় নামবে। সে আমি খুঁজে আনবো'খন", ছবুলা বললো।

"সরমা আছে," দীপক বললো।

"সে দেখা যাবে।"

মীনা ফিরে এলো রাশিয়া থেকে। ওর সঙ্গে ফিরে এলো অন্য যারা ওর সঙ্গে গিয়েছিলো, তারাও।

ওদের অভিনন্দন উপলক্ষে একটি পার্টি দিলো চিত্র-সাংবাদিক-সংঘ।

বিমলকে দেখা গেল না সেখানে।

মীনার দুএকজন হিতৈষী বন্ধু তার কানে দুএকটি কথা আভাসে তুলে দিলো।

মীনা শুনলো ছবুলার রেডিওতে প্রোগ্রাম পাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো অনেকদিন। বিমলের তদ্বিরেই সে আবার প্রোগ্রাম পেতে শুরু করেছে। এবং আগের চাইতে অনেক ভালো প্রোগ্রাম পাচ্ছে।

আর শুনলো,—বিমলের নতুন বইতেই গানের প্লে-ব্যাকে আছে ছবুলা। এটা সম্ভব হয়েছে বিমলের যোগাযোগেই।

তারপর রঞ্জন বললো, "সেদিন জানো, কী সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। এক জায়গায় খেতে গিয়ে দেখি বিমল আর সঙ্গে শাড়ি পরে একজন। মেয়েটি আমার দিকে পেছন ফিরে ছিলো। বিমলকে তো আর কারো সঙ্গে কোনোদিন দেখিনি। তাই ভাবলাম, নিশ্চয়ই তুমি। অবাক হয়ে ভাবলাম, কী আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি ফিরে এসেছো, আমরা কোনো খবর পেলাম না, কাগজেও কোনো খবর বেরুলো না, এ কি করে হতে পারে? তাই তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম, কনগ্র্যাচুলেট্ করতে। কাছে গিয়ে দেখি, তুমি নও। আমাদের ছবুলা। আমরা ফিল্‌মে অভিনয় করি বলে তো সে

আমাদের খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। তাই আর কোনো কথা না বলে, আমি যে ওদের দেখেছি সেটা জানতে না দিয়ে চুপচাপ নিজের জায়গায় ফিরে এলাম।"

শুনে মীনার প্রথমটা খুব রাগ হোলো রঞ্জনের উপর। যা বলতে চায় সোজাসুজি বললেই পারে। তাহলে তাকে মুখের উপর পষ্ট বলে দেওয়া যায় যে আমাদের ব্যাপার নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে। যে ভাবে বললো তাতে কিছুই বলা যায় না।

মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বললো, "বিমলের সঙ্গে কাউকে দেখলে আমি বলে ভুল করা নিতান্ত বোকামি রঞ্জন। কলকাতায় ওর চেনা-শোনার অভাব নেই। আর ছবুলা আমাদের অনেকদিনের বন্ধু।"

রঞ্জন একটু মুচকি হেসে সেখান থেকে সরে গেল।

মীনার মনে জ্বালা ধরে গেল। এবার রাগ হোলো বিমলের উপর। হ্যাঁ, ছবুলার সঙ্গে এমনি বন্ধুত্ব খুব, কিন্তু যে রকম সবাই এসে বলছে, এরকম ভাবে তো ওরা আগে কোনোদিন ঘুরে বেড়ায়নি।

স্থির করলো বাড়ি ফিরে বিমলকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

বাড়ি ফিরে বিমলকে জিজ্ঞেস করি করি করেও জিজ্ঞেস করা হয়ে উঠলো না। মনে কি রকম যেন একটা সঙ্কোচ এলো। মন ভার করে রইলো সারাটাক্ষণ। যখন দেখলো বিমল লক্ষ্যই করছে না যে তার মন ভার, তখন রাগ আরো বেশী করে হোলো।

তারপরদিন বিকেল বেলা মীনা বিমলকে বললো, "চলো, মার্কেটে যাই, কিছু পর্দার কাপড় কিনতে হবে।"

বিমল একটু ইতস্তত করে বললো, "আজ থাক, কাল পরশু যাওয়া যাবে। আজ অন্য একটা কাজ আছে।"

মীনা কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারলো না কি কাজ।

বিমল বেরিয়ে যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে সেও গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

ছবুলাদের বাড়ির কিছু দূরে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো সে। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে আস্তে আস্তে চলে এলো ছবুলাদের বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে শুনলো ছবুলা গান গাইছে। পিলু সুরে ভারী মিষ্টি একখানি গান। গানের ভাষাটা শুনেই সে চিনলো। গানটি বিমলের লেখা। বাইরে থেকে ভেতরের খানিকটা দেখা যায় সামনের খোলা জানলা দিয়ে। দেখলো তক্তপোশের উপর বসে বিমল তন্ময় হয়ে ছবুলার গান শুনছে।

মীনা সেখানে আর দাঁড়ালো না। ফিরে এসে গাড়িতে উঠে বসলো। ড্রাইভারকে বললো দীপকের ওখানে নিয়ে যেতে।

দীপক মীনাকে দেখে খুব খুশী। রাশিয়া থেকে ফিরে এসে এই প্রথম তার বাড়ি এসেছে।

কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই দেখলো মীনার চোখদুটো জলে টলটল করছে।

"কী হয়েছে রে?" দীপক জিজ্ঞেস করলো।

কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই মীনা কেঁদে ফেললো। তারপর চোখটোখ মুছে বললো, "বিমলকে দেখলাম ছবুলার ওখানে। সে গান গাইছে, ও শুনছে।"

দীপকের মুখও মেঘলা হয়ে গেল।

কিন্তু মুখে জোর করে হাসি টেনে এনে সান্ত্বনার সুরে বললো,

"কী ছেলেমানুষ তুই! এতেই এভাবে কান্নাকাটি করার কী আছে?"

মীনা বললো, "বিমলকে বললাম, রাশিয়ায় কি দেখে এলাম, তার উপর একটি প্রবন্ধ লিখে দাও, একটি কাগজ থেকে খুব ধরেছে। আমার তো লেখা আসে না, ওকে না বলে আর কাকে বলবো? ও বললো ওর সময় নেই। খুব কাজ। আজ বিকেলে আমার সঙ্গে মার্কেটে যেতে বললাম। উত্তর দিলো, সময় নেই। খুব কাজ।—এতই যদি কাজ, তো ছবুলাকে বিয়ে করলেই পারতো, আমায় কেন এভাবে ফাঁকি দিচ্ছে।"

দীপক বললো, "আমার মনে হয় এসব তোর মনগড়া দুঃখ, এ কিছুই নয়। ছবুলার পক্ষে কোনোরকম অন্যায় করা সম্ভব, এ আমি বিশ্বাসই করি না। তবে নানারকম কথা শুনছি। এদ্দিন গা করিনি। আচ্ছা, এবার একটু খোঁজ নিয়ে দেখছি কি ব্যাপার। তুই ভাবিস নে, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মীনা চোখ দুটো রুমাল দিয়ে পুঁছলো।

একটু চুপ করে থেকে দীপক বললো, "জানিস, বিমল আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। আমার জন্যে সে একটি নতুন নাটক লিখেছে। আরো লিখবে বলেছে। এই নাটকে সে নিজে অভিনয়ও করবে।"

মীনা অবাক হয়ে তাকালো দীপকের দিকে, বললো, "তাই নাকি? তুমি কি করে ওকে রাজী করালে?"

দীপক একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপলো।

তারপর বললো, "আমি তো রাজী করাই নি। ছবুলাই–" বলে থামলো।

মীনা আস্তে আস্তে বললো, "এই ব্যাপার!"

দীপক বললো, "সে যাই হোক, তুই ভাবিস নে। দেখি, কী করা যায়।"

মীনা আরেকবার রুমাল দিয়ে চোখ পুঁছলো।

তারপরদিন সকালে ছবুলা এলো মীনার বাড়ি। বিমল তখন ছিলো না।

ওকে দেখে মীনা অবাক। আশা করেনি তাকে।

কিন্তু বহু চেষ্টা করেও আগের মতো সহজ হতে পারলো না ছবুলার সঙ্গে। ফ্যাকাশে হাসি হেসে বললো, "কী ব্যাপার ছবুলা, এদ্দিন পর আমায় হঠাৎ মনে পড়লো যে!"

ছবুলা তার সহজ মিষ্টি হাসিটি হাসলো।

দুচারটি সাধারণ মামুলী কথাবার্তার পর বললো, "মীনা, তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

মীনা চোখ মেলে তাকালো।

"বোধ হয় শুনেছো, বিমল আমাদের জন্যে একটি নতুন নাটক লিখেছে আলিবাবার গল্পটিকে অবলম্বন করে। এটা একটু নতুন ধরনে লেখা, সামাজিক-চেতনা সে এর মধ্যে এমন ভাবে এনেছে যে লোকের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তুমি আজকাল নামকরা ফিল্‌ম্‌স্টার্। দীপক নিজের থেকে তোমায় কোনোদিনই বলবে না। তাই আমি ওকে দিয়ে না বলিয়ে নিজের থেকেই বলতে এলাম।"

"কি?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি যদি এর নায়িকার ভূমিকায় নামো—।"

মীনার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

ছবুলা আস্তে আস্তে বললো, "বিমলের লেখা বই, যেটা দীপক

নামাচ্ছে, তাতে অভিনয় করবার জন্যে অনুরোধ করা হবে তোমাকে, এবং সে অনুরোধ করবো আমি,—এ রকম একটা পরিস্থিতি তিন চার বছর আগে ভাবাই যেতো না। সত্যি, আমাদের কী হয়েছে বলো তো, কেন আমরা এরকম হয়ে গেলাম ?"

মীনা কোনো উত্তর দিলো না। তার চোখ দিয়ে আরো দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। তারপর বললো, "আমি পারবো না ছবুলা।"

"কেন ? এ রকম বিখ্যাত ফিল্ম্স্টার্ হয়ে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করলে তোমার কোনো রকম অসুবিধে হবে বলেই কি ?"

"না, সে জন্যে নয়," মীনা উত্তর দিলো, "কেন, সে কথা আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। আমি, পারবো না।"

ছবুলা আস্তে আস্তে বললো, "মীনা, তোমার দাদা আর আমি কেন এত কষ্ট করছি, সবই জানো। আমাদের একটি নেশা আছে, সেটি নাটক। আমরা নতুন ধরনে করতে চাই সব কিছু। নানারকম ভাবে চেষ্টা করে দেখছি, হয়ে ওঠেনি। এখন দেখছি একটু পেশাদারী হয়ে না উঠলে চলবে না। আমাদের দলের নাম হওয়া দরকার যাতে আমাদের নাম শুনলেই লোকে ভাবে এরা একটা নতুন কিছু, একটা অদ্ভুত ভালো কিছু করছে। তার জন্যে প্রথম দিকের বইগুলোতে দর্শক টানতে হবে। আমাদের নিজেদের হল নেই, হল ভাড়া করে করতে হবে আমাদের। সুতরাং খুব বেশী ঝুঁকি নিতে পারবো না। আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি বই করছি, নতুন ভাবে প্রযোজনা করে। আর তারপর করছি বিমলের নাটকটি। আমরা পুরোনো নাম করা নাটক নতুন ভাবে করবো, আর সেই সঙ্গে তৈরী করবো নতুন নতুন নাটক। তোমার এখন খুব নাম

মীনা। তোমার নাম যদি আমাদের কাজে না লাগলো তো আমরা সবাই এত বন্ধু ছিলাম কেন? তোমাকে আমাদের সঙ্গে পেলে যে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠবে। তুমি আবার এসো আমাদের মধ্যে। সিনেমা তো তোমার রইলোই, এর মধ্যেও তোমার প্রতিভার আরেকটি দিক জনসাধারণকে দেখিয়ে দাও মীনা।"

মীনা আঁচল দিয়ে চোখ পুঁছলো, বললো, "না ছবুলা, আমি পারবো না। কেন পারবো না সে কথা তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারবো না। তোমরা যা করছো করো, আমায় আর এসবের মধ্যে টানবার চেষ্টা কোরো না।"

একটু চুপ করে রইলো সে।

তারপর বললো, "বিমল তো তোমাদের মধ্যে আছে। আমায় আর কেন?"

ছবুলা তাকিয়ে দেখলো মীনার দিকে। বললো, "মীনা, তুমি কি বলতে চাইছো না, আমি আঁচ করতে পারছি। কিন্তু তুমি নিজের থেকে বলছো না বলে আমিও কোনো কৈফিয়ত দিতে চাই না। তবে আজ একটা কথা তোমায় বলি শোনো। বিমল আমার বন্ধু, তুমিও আমার বন্ধু। সে জন্যেই বলছি। বিমল তোমায় কতোখানি ভালোবাসে সে কথা তোমার চাইতে বেশী কেউ জানে না। তুমি বিমলকে কতোখানি ভালোবাসো সে কথাও আমি জানি। তুমি আর বিমল বিয়ে করেছিলে দুজন দুজনকে সাহায্য করবে বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো এই, যে ওর সাহায্য নিয়ে তুমি উঠে গেলে, ও পেছনে পড়ে রইলো। সিনেমার চিত্রনাট্য লেখাতে পয়সা থাকলেও, সেটি ওর প্রতিভার পক্ষে একটা খুব বিস্তৃত ক্ষেত্র নয়। অথচ ওকে বড়ো কিছু করবার জন্যে

তুমি উদ্বুদ্ধ করতে পারলে না। তুমি রাশিয়া চলে যাওয়ার পর ও হঠাৎ এতটা নিঃসঙ্গ বোধ করলো যে বলবার নয়। তার কারণ শুধু এই নয় যে তুমি কয়েকদিনের জন্যে রাশিয়া যাচ্ছো।"

আস্তে আস্তে মীনার মনের উপর থেকে একটা পর্দা উঠতে শুরু করলো। সে শুনে গেল চুপচাপ।

ছবুলা বলে গেল, "আমিই যে তাকে প্রথম বলেছিলাম, বিমল, তুমি লেখো, সে কথা তার বোধ হয় মনে পড়লো তখন। সে আমার কাছে এলো। দেখলাম, আমি যদি তাকে সাহায্য না করি, সে বদলে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে তার সমস্ত প্রতিভা। নাটকই হচ্ছে তার প্রতিভার আসল ক্ষেত্র, এদিকেই রাখতে হবে তাকে। সিনেমার চিত্রনাট্য লেখা, সে হবে শুধু তার উপজীবিকা মাত্র। তুমি জানো না মীনা, তোমার,—আর বিমলেরও,—কি রকম ফাঁড়া গেছে। সে যদি আমার কাছে না আসতো! নিঃসঙ্গ বোধ করে আমার কাছে না এসে সে যদি—"

"ছবুলা!" চিৎকার করে উঠলো মীনা।

"আমি ভেবে দেখলাম, আমরা সবাই বন্ধু, বিমলকে সাহায্য আমায়ই করতে হবে। আমি এও জানতাম যে এতে ঝুঁকি অনেক। নানারকম কথা উঠতে পারে। তুমি আমায় ভুল বুঝতে পারো। তবু ভাবলাম, আমরা সবাই বন্ধু, আমার বিবেক পরিষ্কার থাকলে, তোমাদের ভুল-বোঝা পরিষ্কার করে দিতে আমার অসুবিধে হবে না। বিমলও যে আমার উপকার করলো না, তা নয়। মাঝখানে আমার রেডিওতে প্রোগ্রাম পাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বিমল সেটি তদ্বির করে ব্যবস্থা করে দিলো। ফিল্ম্ লাইনে যোগাযোগ করিয়ে দিলো। আমাদের এই বাইরের যোগা-যোগগুলি খুবই দরকার আমাদের অভিনয়ের দলটির সাফল্যের

জন্যে। তুমি যদি আসো, বিমল যদি আসে, আমার সামান্য সামর্থ্য নিয়ে আমি যদি আসি, দীপক জোর পায়। আমি চাইনা যে দীপকও বাইরের এসমস্ত যোগাযোগের মধ্যে থাকুক। সে থাকুক এসবের বাইরে, আমাদের সবার উপরে।"

মীনা একটা হাত রাখলো ছবুলার কাঁধের উপর, কোনো কথা বললো না।

"তুমি জানবার চেষ্টা করোনি মীনা, চেষ্টা করবার ফুরসতও পাও নি," ছবুলা বলে গেল, "আর্থিক দিক থেকে তুমি যে সাফল্য লাভ করেছো, বিমল করেনি, এতে বিমলের মনের আত্মবিশ্বাস কতোখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। আমি তার জন্যে এমন কিছু করিনি, শুধু তার সঙ্গে বসে গল্প করেছি, তাকে অনেক গান শুনিয়েছি। এই সময়টা যে সে একলা বসে আবোলতাবোল ভেবে, মনগড়া দুঃখ তৈরী করে যে মনের দিক থেকে আরো অসুস্থ হয়ে ওঠে নি, তাই অনেক। বরং সে কয়েকটি খুব সহজ দিন কাটিয়ে মনের জোর অনেক ফিরে পেয়েছে। ফিল্‌ম্ লাইনটাকে তুমি তো চেনো মীনা, তার মধ্যে থাকলে, তার অস্বাভাবিক দ্রুত পরিবেশে সবারই স্নায়ু কতোখানি উত্তেজিত হয়ে থাকে সব সময়। এখন সে আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছে আমাদের নতুন পরিকল্পনায়, নিজের থেকেই নানারকম অনেক নতুন কিছু করবার কথা ভাবছে। তাই আজ শুধু দীপকের জন্যে নয়, আমার জন্যে নয়, বিশেষ করে বিমলের জন্যে, তোমাকে চাইছি আমাদের মধ্যে। এর মধ্যে তোমাকেও পেলে, সে তার নিজের উপর বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাবে ফিরে পাবে মীনা। তার প্রতিভা তখন নতুন সৃষ্টির জোর পাবে। কিন্তু তোমায় তার পাশে পাশে থাকতে হবে সব সময়।"

মীনার চোখ তখনো সজল। বললো, "ছবুলা, আমি চেষ্টা

করবো। বিমলকে আমি নিজে বলবো, দাদাকে তুমিও বোলো, পরে আমিও বলবো, কোনো কিছুর জন্যে আমায় এরকম অনুরোধ করলে, লৌকিকতা করলে, আমি ভীষণ রাগ করবো। আমায় কোনো কিছুর জন্যে দরকার হলে, দাদা বা তুমি এসে বলবে, মীনা, তোমায় এটা করতে হবে। দেখবে, আমি তক্ষুনি রাজী।"

তারপর ছবুলার দুকাঁধে হাত রেখে মীনা আস্তে আস্তে বললো, "তুমি আমার মন আজ একেবারে হাল্কা করে দিয়েছো। এই কদিন যে আমার কি ভাবে কেটেছে সে শুধু আমিই জানি। জানো, আমি কতো কি ভাবছিলাম। রঞ্জন আমায় যা বললো, তাতে আমার এই ক'রাত্তির আর চোখে ঘুম নেই।"

"কে বললো?"

"রঞ্জন। জানো, বিমলের উপর ওর খুব হিংসে," মীনা একটু হেসে বললো।

"কেন?"

"ও কোথায় যেন তোমায় আর বিমলকে একসঙ্গে বসে খেতে দেখেছে।"

ছবুলা চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর বললো, "মীনা, আজ তোমায় একটা কথা বলছি। কাউকে কোনোদিন বোলো না কিন্তু।"

"কি?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"দীপক আমায় বিয়ে করতে চেয়েছে।"

"সত্যি?" মীনা খুব খুশী হয়ে ছবুলাকে জড়িয়ে ধরলো, "ঈশ, আমি আগে যদি জানতাম, এত কষ্ট পেতাম না। আমায় আগে বলো নি কেন, দুষ্টু কোথাকার!"

ছবুলা চুপ করে রইলো।

"তুমি রাজী হয়েছো তো ?" মীনা জিজ্ঞেস করলো।

"এখনো হইনি।"

"কেন ?" মীনা খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ছবুলা খুব আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "আমি যে আর কোনোদিন কাউকে বিয়ে করতে পারবো না,—এ ধারণা আমার মন থেকে এখনো যায় নি।"

মীনা তাকিয়ে রইলো ছবুলার দিকে।

আস্তে আস্তে ওর চোখ আবার সজল হয়ে এলো।

ছবুলার চোখও। সে চোখ নামিয়ে নিলো।

মীনা আস্তে আস্তে বললো, "ছবুলা, তুমি কী বোকা !"

ছবুলা আর বেশীক্ষণ বসলো না।

চলে গেল।

দিনকয় পর হঠাৎ রঞ্জন এসে উপস্থিত হোলো ছবুলার বাড়িতে।

"হঠাৎ কী মনে করে, রঞ্জন," ছবুলা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো। তাকে বসতেও বললো না।

"শুনলাম তোমরা নাকি বিমলের একটি নতুন নাটক অভিনয় করছো," রঞ্জন উত্তর দিলো। "তাতে দীপক আর তুমি তো আছোই, বিমল আর মীনাও নাকি যোগ দিচ্ছে ?"

ছবুলা ঘাড় নাড়লো।

"সবই যদি আস্তে আস্তে আবার আগের মতো হয়ে এলো তো আমি কি অপরাধ করলাম ?" রঞ্জন বললো।

"তুমি কি চাও ?"

"আমাকেও নাও তোমাদের মধ্যে।"

"না।"

"কেন?"

"তোমাকে দরকার নেই বলে—।"

রঞ্জন বললো, "তুমি একথা জানো ছবুলা যে আমায় নিলে তোমাদের নাটক দেখতে কী পরিমান দর্শকের ভিড় হবে?"

"জানি," ছবুলা উত্তর দিলো, "একথাও জানি যে তোমায় না নিলেও ভিড় হবে। ফিল্‌ম্ স্টার রঞ্জন গুহ স্টেজে নামছে একথা বিজ্ঞাপন দিয়ে সবাইকে জানিয়ে আমরা দর্শক টানতে চাইনা রঞ্জন. নতুন ধরনের নাটকের আকর্ষণে লোক টানতে চাই। সুতরাং তোমায় আমাদের দরকার নেই। তুমি যাও রঞ্জন, তোমার সময়ের অনেক দাম, এখানে এসে মিছি মিছি সময় নষ্ট কোরো না।"

রঞ্জন আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

কী যেন ভাবছিলো সে। হঠাৎ দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, "সরমাকে চেনো?"

"হ্যাঁ, চিনি," ছবুলা নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলো।

রঞ্জন আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে চলে গেল।

ছবুলা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

তারপর আস্তে আস্তে আশ্চর্যরকম জনপ্রিয় হয়ে গেল দীপক-দের নতুন অভিনয়ের দল—নব-রূপায়ন। রবীন্দ্রনাথের বই, শরৎচন্দ্রের বই, যেসব বইয়ের নাট্যরূপ দিতে আর কেউ সাহস করেনি এ পর্যন্ত, সেসব বইয়ের অচিন্তনীয় নাট্যরূপায়ন দর্শক-সাধারণকে বিমুগ্ধ করলো। পুরনো নাটক,—চন্দ্রগুপ্ত. মিশর-কুমারী, আলিবাবা, শাজাহান প্রভৃতি—লোকের সামনে উপস্থিত করলো নতুন পরিকল্পনায়, নতুন টেকনিকে. এযুগের সামাজিক-চেতনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে। নতুন নাট্যকারদের নতুন নাটক,—বিমল সাহার এবং আরো দুএকজনের,—নতুন আঙ্গিক, নতুন বিষয়বস্তু, নতুন ভাবধারার অভিনবত্ব বিস্মিত করলো সবাইকে।

আর আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করলো দর্শকসাধারণের রুচি, এবং কলকাতার শৌখিন নাটকের দলগুলির অভিনীত নাটকের ধরন, প্রযোজনার ভঙ্গী, অভিনয়ের ধারা।

নতুন নাট্যআন্দোলনের আভাস দেখা দিলো কলকাতায়।

আর ইতিমধ্যে আস্তে আস্তে জনপ্রিয়তা হারালো রঞ্জন গুহ।

নতুন নায়ক আবির্ভূত হোলো সিনেমা-জগতে। আর আস্তে আস্তে কমতে লাগলো রঞ্জনের কনট্রাক্ট।

মনোহরদাসের অন্যান্য ব্যবসার তখন পড়তি অবস্থা। সেও তখন একটি অভিনয়ের দল করে এখানে সেখানে হল ভাড়া করে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে চলতি নাটকগুলোর প্রযোজনা করছিলো একটার পর একটা। রঞ্জন আবার এসে জুটলো তার সঙ্গে।

কিন্তু চাকা আর ঘুরতে চাইলো না কিছুতেই।

হাওড়ায় সেবার একটি কিষাণ কনফারেন্সের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার আবেদন এলো নব-রূপায়নের কাছে। ওরা বিমলের একটি নতুন নাটকের অভিনয় করলো সেখানে।

অত্যন্ত সাফল্যময় হোলো এই নাটক। একজন সাধারণ চাষীর দৈনন্দিন জীবন নিয়ে লেখা এই নাটক বিপুল অভিনন্দন পেলো জনতার কাছে। বিশেষ অনুরোধে নাটকটির অভিনয় হোলো পর পর দুরাত্রি। তারপর আরো কয়েক রাত্রি দেখানোর ব্যবস্থা হোলো।

মনোহরদাস ক্ষেপে গেল। ঠিক সেই সময় হাওড়ার একটি প্রেক্ষাগৃহ বহু টাকা দিয়ে ভাড়া করে সে তার দলবল নিয়ে নামিয়েছিলো ঐতিহাসিক নাটক। জমকালো সাজসজ্জা, নতুন টেকনিকে মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ইত্যাদির পেছনে সে বহু টাকা খাটিয়েছিলো। সেটা দেখতে না এসে লোকে যে দেখতে যাচ্ছে মাঠের মাঝখানে খাটানো মঞ্চে ফিকে নীল আর গাঢ় সবুজ একটি পটভূমিকার সামনে ছেঁড়া জামা কাপড় পরা কয়েকজনের অভিনয়— এটা মনোহরদাসের আর সহ্য হোলো না। ওদের থাকলোই বা মীনা সাহা আর ছবুলা গাঙ্গুলী, মনোহরদাসের কি রঞ্জন গুহ নেই, আসমানীবাঈ নেই? লোকের কী রুচি হচ্ছে দিনের পর দিন, মনোহরদাস বললো।

"আমাদের নাটকটা দুদিন পরে করলেই হয়," রঞ্জন বললো। "ওদেরটা হয়ে যাক।"

"না। এ দুদিন হলভাড়া গুণবে কে?"

"কিন্তু এমনিতেই তো লোক না আসায় ক্ষতি হচ্ছে—।"

"যা হবার হয়েছে। আর হবে না," বললো মনোহরদাস। "আমার মাথায় একটা মতলব আছে। ওদের অভিনয় যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা করছি।"

"মতলবটা কি ?" রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো।

"বলবো না।"

"আমাকেও নয় ?"

মনোহরদাস চোখ টিপে হেসে বললো, "কাউকে না।"

"কেন ?"

"তুমিতো একদিন ছবুলা গাঙ্গুলীর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলে।"

সন্ধ্যেবেলা। মাঠে খুব ভিড়। তখন অভিনয় হচ্ছে নব-রূপায়নের নাটক।

দুটি দৃশ্য শেষ হোলো।

মঞ্চের পেছন দিকে পর্দা টাঙিয়ে একটি সাজঘরের মতো করা হয়েছে।

ছবুলা সেখানে চট করে একটু চা খেয়ে নিচ্ছিলো।

কনফারেন্সের একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে বললো, "একটি লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

"কে সে ?"

"নাম বললো রঞ্জন গুহ।"

"বলে দাও দেখা হবে না।"

"বলছে খুব জরুরী দরকার।"

"ওকে বলে দাও ওর সঙ্গে আমার কোনো জরুরী দরকার থাকতে পারে না।"

দীপক বললো, "ওকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। দেখো যেন জোর করে ঢুকে না পড়ে।"

স্বেচ্ছাসেবকটি চলে যেতে দীপক বললো, "ও যে কেন তোমায় এত বিরক্ত করে বুঝি না।"

ছবুলা কোনো উত্তর দিলো না।

তৃতীয় দৃশ্য শেষ হোলো।

চতুর্থ দৃশ্য আরম্ভ হওয়ার একটু আগে হঠাৎ ছুটে এলো একজন স্বেচ্ছাসেবক। বললো, "একটু অপেক্ষা করুন। এই সীন্‌টা এখন আরম্ভ করবেন না। প্যাণ্ডেলের পেছন দিকে আগুন লেগেছে।"

"আগুন লেগেছে!" দীপক ছুটে বেরিয়ে গেল। পেছন পেছন গেল মীনা আর ছবুলা। বিমল বাইরেই ছিলো।

দর্শকেরা তখনো জানে না। প্রতীক্ষা করছে পরের দৃশ্যের।

কনফারেন্সের একজন উদ্যোক্তা এসে বললো, "ভয়ের কোনো কারণ নেই। সামান্য একটুখানি জায়গায় আগুন ধরেছিলো। কে যেন পেট্রল দিয়ে আগুন লাগাবার চেষ্টা করেছিলো। স্বেচ্ছা-সেবকেরা প্রায় নিভিয়ে এনেছে। ভাগ্যিস দর্শকেরা জানতে পারে নি। জানতে পারলে আজ সব পণ্ড হোতো।"

ছবুলা ফিরে আসছিলো। পথে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল রঞ্জনের সঙ্গে। রঞ্জন বললো, "ছবুলা, তোমাকেই খুঁজছিলাম। মনোহরদাস তোমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে—।"

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই আরেকজন স্বেচ্ছাসেবক এসে বললো, "পেছন দিকে আরেক জায়গায় আগুন ধরেছে। পেট্রলের আগুন। নেভানো যাচ্ছে না। কেউ নিশ্চয়ই প্ল্যান করে কনফারেন্স পণ্ড করবার চেষ্টা করছে। দর্শকেরা এখনো জানে

না। জানলে পরে কেলেঙ্কারি হবে। ওদের গান টান একটা কিছু দিয়ে একটু জমিয়ে রাখতে পারলে ভালো হোতো।"

"আচ্ছা, আমি দেখছি," ছবুলা বললো।

সে এগিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় কোত্থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো—আগুন! আগুন! পালাও! পালাও!

হঠাৎ থেমে গেল দর্শকদের গুঞ্জন, চট করে কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারলো না। হতভম্ব হয়ে গেল সবাই।

"সর্বনাশ করলে," ছবুলা বললো।

"তুমি যেও না ছবুলা," রঞ্জন বললো, "দর্শকদের আমি সামলাচ্ছি,"— বলে ছুটে গিয়ে একলাফে উঠে পড়লো মঞ্চের উপর, আর উইংস্‌এর পেছন থেকে মাইকটি তুলে আনলো।

বললো, "আগুন লাগে নি, মিছে কথা—।"

দর্শকদের এক মুহূর্তের বিহ্বলতার সুযোগ নিলো সে।

বললো, "পরের সীন আরম্ভ হতে একটু দেরি হবে। ততক্ষণ আপনারা আমার একখানি গান শুনুন।"

গান ধরলো রঞ্জন।

"ভদ্রলোক বাঁচিয়ে দিলে। কে ইনি?" জিজ্ঞেস করলো একজন স্বেচ্ছাসেবক।

অদ্ভুত গান! আগুনের ছোঁয়া সুরের প্রত্যেকটি পর্দায়, গানের প্রত্যেকটি কথায়।

কে লিখলো এই গান? কে সুর দিলো?—ছবুলা অবাক হয়ে ভাবলো।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সেই উদাত্ত কণ্ঠের গান শুনতে লাগলো দর্শকেরা।

ছবুলা পেছন ফিরে তাকালো। একি! প্যাণ্ডেলের পেছন

দিকে একটু দূরে আগুনের শিখায় লাল হয়ে উঠেছে চারদিক। কোনো গণ্ডগোল না করে জল ঢেলে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকেরা।

কিন্তু দর্শকদের খেয়াল নেই।

স্বেচ্ছাসেবকটি ছবুলাকে বললো, "আর ভয় নেই। আগুন এদিকে আসবে না। দর্শকদের কোনো রকমে অন্য কিছুতে নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে কেউ আর জানতে পারবে না। আগুন নেভানো হয়ে যাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। আমাদের আগুন নেভানোর ভালো ব্যবস্থা করা আছে।"

দর্শকেরা তখন রঞ্জনের গান মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

ছবুলাও অবাক হয়ে শুনতে লাগলো। রঞ্জন গাইছে! তার চেনা ছেলে সেই রঞ্জন?

হঠাৎ দুলে উঠলো তার মন।

মাঠের অন্য প্রান্তে অন্ধকারের আড়ালে মনোহরদাস দাঁতে দাঁত ঘষলো। বললো, "শেষ পর্যন্ত রঞ্জন বেইমানী করলো? আচ্ছা!" একটু ভাবলো। "আচ্ছা, দেখে নিচ্ছি তাকে।"

সঙ্গে লোক ছিলো একজন। তাকে বললো, "আমায় দে তো একটি টিন।"

"বাবুজী, আপনি?"

"হ্যাঁ, আমি নিজেই যাচ্ছি—।"

পেট্রলের টিন হাতে করে সাজঘরের ভেতর দিয়ে মঞ্চের পেছন দিকে চলে গেল মনোহরদাস।

ওদিকটা তখন ফাঁকা।

রঞ্জন দর্শকদের মনে আর ছবুলার মনে সুরের আগুন জ্বালিয়ে

দিলো। ছবুলা ভুলে গেল কোথায় কোন মাঠে এক প্যাণ্ডেলের পেছন দিকে আগুন ধরেছে আর জল ঢালছে স্বেচ্ছাসেবকেরা।

আর দর্শকেরা জানলোই না কিছুই—।

হঠাৎ—

হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো অভিনয়ের মঞ্চ, জ্বলে উঠলো উইংস্, স্ক্রীন্, ড্রপ্, সব কিছু। আগুন ঘিরে ধরলো রঞ্জনকে, চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো। পেট্রলের গন্ধ, বাঁশ ফাটা শব্দ,— হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল রুপালী মাইক আর ধ্বসে পড়লো স্টেজটি।

সভাস্থল এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর হৈ চৈ পড়ে গেল চারদিকে। আগুন! আগুন!!

"রঞ্জন!" ছবুলা চেঁচিয়ে উঠলো, ঘুরে ছুটে গেল মঞ্চের দিকে। কিন্তু তাকে দীপক ধরে ফেললো।

বললো, "দাঁড়াও, ওদিকে যেও না। আমরা দেখছি—।"

আগুনের ভেতর থেকে টলতে টলতে একজন বেরিয়ে এলো। সারা শরীর পুড়ে গেছে। এসে মুখ থুবড়ে পড়লো সবার সামনে।

ছবুলা চিনলো। লোকটি মনোহরদাস।

আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে বেরিয়ে আসবার আগেই কি করে যেন আটকে গিয়েছিলো —।

—কিন্তু রঞ্জন? রঞ্জন কোথায়? রঞ্জন!!!—

দীপক তাকালো ছবুলার দিকে। মীনা, বিমল এরাও তাকালো।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছবুলার ফ্যাকাশে চোখ মুখ।

কিন্তু কোনো কথা নেই তার মুখে।

তারপরদিন সন্ধ্যেবেলা।

বলাকার শেষ সারি মিলিয়ে গেল দক্ষিণ দিগন্তে। দূর হাজরা রোডের মোড়ে ট্রাফিকে আলোড়ন জাগলো। সবুজ গাছের পাতা-ঝির-ঝির পরিবেশে অন্ধকার নামলো রাস্তার এ পাশে ও পাশে। সিঁড়ি ঘাড়ে করে একজন এসে ফ্যাকাশে-নীল গ্যাস লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে গেল আশে পাশের সরু সরু অলি গলিতে।

মন্থর পায়ে পায়ে দীপক বস্তি অঞ্চলের ভিতর এসে ঢুকলো। হ্যারিকেনের আলো টিম-টিম মুদীর দোকান ডাইনে রেখে বুড়ো হিন্দুস্থানীর ফাঁকা চায়ের দোকান বাঁয়ে ফেলে টিউবওয়েলটির পাশ কাটিয়ে মোড় ফিরে চলে এলো ছবুলার বাড়ি।

পাশের জানলার দিকে মুখ করে দরজার দিকে পেছন ফিরে ছবুলা তখন ছায়ানটের আলাপ বাজাচ্ছে তার সেতারে।

দীপক বাইরে জুতো খুলে চুপচাপ ছবুলার পেছনে এসে দাঁড়ালো।

সেতারে সুরের অনুরণন অস্ফুট মৃদু হয়ে এলো।

"তুমি কেন তাকে একবার দেখতে গেলে না ছবুলা?" দীপক জিজ্ঞেস করলো।

সেতারে একটি গমক গুমরে উঠলো।

"হাসপাতালে অনেকেই তাকে দেখতে এসেছিলো। শেষ সময় কিছুক্ষণের জন্যে ওর জ্ঞান ফিরেছিলো। আমি পাশেই ছিলাম। তোমার কথা জিজ্ঞেস করলো।"

তরপের তারগুলো গুঞ্জন করে উঠলো।

"তোমায় সে নাকি বলেছিলো একদিন তার নিজের লেখা গান শোনাবে। বললো, তোমায় পেলে জিজ্ঞেস করতো তার শেষ গানখানি তোমার কি রকম লাগলো।"

সুরের তরঙ্গ দুলতে দুলতে চড়ার দিকে উঠতে লাগলো।

"তোমায় একটি কথা জানাতে বললো। সে নাকি নিজে একদিন বলতে চেয়েছিলো। তুমি শুনতে চাও নি। সরমা নামে সেই মেয়েটি, যার জন্যে তুমি গিয়ে ঝগড়া করেছিলে অমর চাটুজ্যের সঙ্গে, তাকেই বছর খানেক আগে রঞ্জন বিয়ে করেছিলো। তা নইলে নাকি মেয়েটি নিরাশ্রয় হয়ে পড়তো, এবং জীবনের খুঁটি হারিয়ে ফেলতো সে নিজেও। বললো, তোমায় বললে তুমি নাকি বুঝবে সে কি বলতে চাইছে। ওর একটি ছেলে হবে বোধ হয় শিগ্‌গিরই। আমরা যেন তার দেখাশোনা করি। সরমা ভালো অভিনয় করে, গানও ভালো গায়, তাকে যেন আমাদের গ্রুপে নিয়ে নিই।"

সেতার হঠাৎ কখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

তেমনি হঠাৎ আবার বাজতে শুরু করলো।

"ছবুলা!"

একটি দীর্ঘ জলদ তানের স্রোত বয়ে গেল।

"আমাদের ছেলেবেলার দিনগুলো মনে পড়ে ছবুলা? সে এক সময় ছিলো যখন আমাদের দিনগুলো ছিলো তোমার আর আমার একলার। তারপর একটি সময় এলো যখন আমাদের দিনগুলো বেওয়ারিশ হয়ে গেল। আজ তোমায় বলে যেতে চাই, ছবুলা, সামনে জীবনের যে ঝোড়ো দিনগুলো আসছে, তোমায় আমি তার মধ্যে একলা ছেড়ে দিতে পারবো না।"

তরপের তারগুলোর উপর দিয়ে তখন সুরের ঝঙ্কার চলছে।

"তুমি যা চেয়েছো, ছবুলা, আর তুমি যা পাও নি, সেই ক্ষতি মিটিয়ে দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই, তবে ঘরোয়া জীবনের শান্তি, যত্ন আর ছোটোখাটো আশা আকাঙ্খার কোনো দাম যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে তোমার আমার সাহচর্য আমাদের জীবনে কোনোরকম আক্ষেপের অবকাশ রাখবে না।"

সেতারের ঘাটে ঘাটে ছবুলার বাঁ হাতের আঙুলগুলো মেঘলা আকাশের বিদ্যুতের মতো দ্রুতসঞ্চার হয়ে উঠলো।

"এবার আমি যাই। আর যা কিছু বলার বাকী রইলো সে সব পরে এক সময় হবে।"

দীপক চলে গেল।

ছবুলা সারাক্ষণই দীপকের দিকে পেছন ফিরে বসেছিলো।

দীপক জানলো না যে ছবুলার মুখ চোখের জলে ভাসছে।

সমে এসে থামলো ছায়ানটের শেষ পশলা বর্ষণ।

অঝোর কান্নায় ছবুলা কেঁপে কেঁপে উঠলো।